ময়নামতীর মায়াকানন

হেমেন্দ্রকুমার রায়

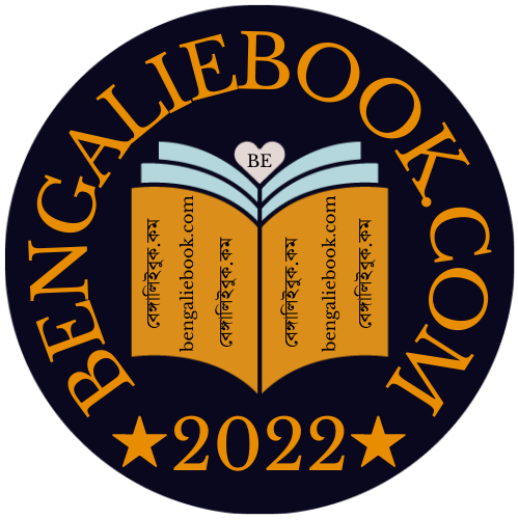

ময়নামতীর মায়াকানন

পূর্ব কথা

বিনয়বাবুর ডায়ারিতে যে অতি আশ্চর্য ঘটনাটি তোলা আছে, তা পড়বার আগে একটুখানি পূর্ব-ইতিহাস জানা দরকার।

ইউরোপ-আমেরিকার পণ্ডিতরা যে আজকাল মার্স বা মঙ্গলগ্রহে যাওয়ার চেষ্টা করছেন, এ খবর এখন বোধহয় পৃথিবীর কারুর কাছেই অজানা নেই।

পণ্ডিতদের মতে, মঙ্গল গ্রহে একরকম জীবের বসতি আছে তাদের চেহারা মানুষের মতো না হলেও মানুষের চেয়ে তারা কম বুদ্ধিমান নয়। অনেকের মতে তাদের বুদ্ধি মানুষেরও চেয়ে বেশি। কিন্তু পণ্ডিতদের কথা এখন থাক।

মঙ্গলগ্রহ থেকে আশ্চর্য এক উড়োজাহাজে চড়ে একদল বেয়াড়া বামন জীব একবার আমাদের পৃথিবীতে বেড়াতে এসেছিল।

যাওয়ার সময়ে অদ্ভুত উপায়ে তারা অনেক মানুষকে মঙ্গলগ্রহে ধরে নিয়ে গিয়েছিল।

বন্দিদের ভিতরে ছিল বিমল, কুমার ও রামহরি–যাঁরা যকের ধন উপন্যাস পড়েছেন তাদের কাছে ওরা অপরিচিত নয়! বিনয়বাবু ও কমল বন্দি হয়েছিল–এবং সঙ্গে ছিল কুমারের বড় আদরের বাঘা কুকুর।

বিনয়বাবু বয়সে প্রৌঢ়–নানা বিষয়ে জ্ঞান তার অগাধ। অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য তাঁর নখদর্পণে! দলের সকলেই তাঁকে মানত ও শ্রদ্ধা করত।

বিমল, কুমার ও কমল বয়সে যুবক। বিমলের সাহস ও বাহুবল অসাধারণ।

রামহরি হচ্ছে বিমলের পুরোনো চাকর।

অন্যান্য বন্দিদের পরিচয় আপাতত অনাবশ্যক।

মঙ্গলগ্রহে যেসব রোমহর্ষক ও আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল, বিনয়বাবুর ডায়ারিতে তা লেখা আছে। ডায়ারির সেই কাহিনি মেঘদূতের মর্ত্যে আগমন নামে উপন্যাসে প্রকাশিত হয়ে গেছে।

ময়নামতীর মায়াকানন যদিও সম্পূর্ণ নতুন এক উপন্যাস, তবু এর আরম্ভ হয়েছে মেঘদূতের মর্ত্যে আগমনের শেষ পরিচ্ছদের শেষ অংশ থেকে।

বুদ্ধি ও শক্তিতে পরাস্ত হয়ে মঙ্গলগ্রহের বামনরা শেষটা বন্দি মানুষদের হাতেই বন্দি অবস্থায় উড়োজাহাজ নিয়ে পৃথিবীতে আসতে বাধ্য হয়েছিল।

বিনয়বাবুর ডায়ারির সেই স্থানটি মেঘদূতের মর্ত্যে আগমন থেকে আমি এখানে উদ্ধার করে দিলুম।

ওই ফুটে উঠছে ভোরের আলো–পূর্ব আকাশের তলায় আশার একটা সাদা রেখার মতো। আকাশের বুকে তখনও রাতের কালো ছায়া ঘুমিয়ে আছে এবং সামনের দৃশ্য তখনও অন্ধকারের আস্তরণে ঢাকা। তবে, অন্ধকার এখন অনেকটা পাতলা হয়ে এসেছে বটে।

মুখ বাড়িয়ে দেখলুম, পৃথিবীর সমস্তই আবছায়ার মতো, এখনও গাছপালার সবুজ রং চোখের উপরে ভেসে ওঠেনি!

বিমল, কুমার, কমল ও রামহরি আর থাকতে পারলে না, তারা তখনই উড়োজাহাজ ছেড়ে নেমে পড়ল। আমিও নীচে নামলুমবাঘাও আমাদের সঙ্গ ছাড়লে!

আঃ, কী আরাম! এতকাল পরে পৃথিবীর প্রথম স্পর্শ সে যে কি মিষ্টি! মাটিতে পা দিয়েই টের পেলুম, আমরা স্বদেশে ফিরে এসেছি!

কমল তড়াক করে এক লাফ মেরে বলল, হাঁ এ আমাদের পৃথিবীই বটে! এক লাফে আমি আর তিনতলার সমান উঁচু হতে পারলুম না তো।

খানিক তফাতে হঠাৎ কি একটা শব্দ হল–দুড়ুম দুড়ুম দুড়ুম যেন ভীষণ ভারী পায়ের শব্দ!

আমরা সচমকে সামনের দিকে তাকালুম। অন্ধকারের আবরণ তখনও সরে যায়নি, তবে একটু দূরে প্রকাণ্ড একটা চলন্ত পাহাড়ের কালো ছায়ার মতো কি যেন চলে যাচ্ছে বলে মনে হল।

বাঘা ভয়ানক জোরে ডেকে উঠল, আমাদের সবাই স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে রইলুম।

নিজেদের চোখকে যদি বিশ্বাস করতে হয় তাহলে বলতে পারি আমাদের সমুখ দিয়ে যে জীবটা চলে যাচ্ছে সেটা তালগাছের চেয়ে কম উঁচু হবে না! তার পায়ের তালে দেহের ভারে পৃথিবীর বুক ঘন ঘন কেঁপে উঠছে..

মহাকায় জীবটা কোথায় মিলিয়ে গেল, কিন্তু তার চলার শব্দ তখনও শোনা যেতে লাগল–দুড়ুম দুড়ুম দুড়ুম।

বিমল শুষ্ক স্বরে বললে, বিনয়বাবু।

আঁ?

ওটা কি?

অন্ধকারে তো কিছুই দেখতে পেলুম না।

কিন্তু যেটুকু দেখলুম, তাই-ই কি ভয়ানক নয়? এ আমরা কোথায় এলুম?

পৃথিবীতে!

কিন্তু এইমাত্র যাকে দেখলুম, সে কি পৃথিবীর?

আমিও অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম। ওদিকে আকাশের কোলে শুয়ে ঊষার চোখ ক্রমেই ফুটে উঠতে লাগল।

.

বিনয়বাবুর ডায়ারি

অপূর্ব পৃথিবী

ঊষার চোখ ক্রমেই ফুটে উঠছে!...কিন্তু পৃথিবী তখনও আপনার বুকের উপর থেকে আবছায়ার চাদরখানি খুলে রেখে দেয়নি।

যেদিকে সেই মহাকায় জীবটা চলে গেল, সেইদিকে হতভম্বের মতো তাকিয়ে আমরা কয়জনে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি।

আচম্বিতে আর এক অপরিচিত শব্দে আমরা সকলেই চমকে উঠলুম! যেন হাজার হাজার শ্লেটের উপরে কারা হাজার হাজার পেনসিল টানছে আর টানছে!

এক লহমায় আমাদের আড়ষ্টভাব ঘুচে গেল।

কুমার সর্বাগ্রে চেঁচিয়ে উঠল, বামনদের উড়োজাহাজ।

বিমল বললে, সে কী কথা। উড়োজাহাজ তো বিকল হয়ে পৃথিবীতে এসে নেমেছে, মেরামত না করলে আর উড়তে পারবে না!

রামহরি আকাশের দিকে হাত তুলে বললে, ওই দেখো খোকাবাবু!

আমাদের চোখের সামনে দিয়ে বিপুল একটা কালো ছায়া ঠিক বিদ্যুতের মতো বেগে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এ মঙ্গলগ্রহের উড়োজাহাজই বটে!

কুমার বললে, কী সর্বনাশ! অনেক মানুষ যে ওর মধ্যে আছে।

কমল তাড়াতাড়ি বললে, কুমারবাবু, বন্দুক ছুড়ুন, বন্দুক ছুড়ুন!

বিমল হতাশভাবে বললে, আর মিছে চেষ্টা! বামনরা আমাদের চোখে ধুলো দিয়েছে, উড়োজাহাজ বন্দুকের সীমানার বাইরে চলে গেছে।

এরই মধ্যে উড়োজাহাজখানা আকাশের গায়ে প্রায় মিলিয়ে যাওয়ার মতো হয়েছে—না জানি কতই বেগে সে উড়ে চলেছে।

ভোরের আলো তখন মাটির বুকেও নেমে এসেছে এবং অন্ধকার সরে যাচ্ছে বন-জঙ্গলের ভিতর দিকে।

আমি বললুম, বামনরা যে কী করে চম্পট দিলে কিছুই তো বুঝতে পারছি না, এতগুলো লোককে আমরা তো তাদের উপরে পাহারায় রেখে এসেছি।

বিমল বললে, বোধহয় বন্দুক নিয়ে আমরা চলে আসতেই বামনদের সাহস বেড়েছে, তারা মানুষদের আক্রমণ করেছে!

সম্ভব! কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর লাভ নেই। চলো, যেখানে উড়োজাহাজ এসে নেমেছিল, সেখানটা একবার দেখে আসি!

জায়গাটা বেশি দূরে নয়। আমরা যেদিক থেকে এসেছিলুম আবার সেই দিকেই এগিয়ে চললুম!

তখন চারদিক দিব্য ফরসা হয়ে এসেছে। কিন্তু চোখের সুমুখে যেসব দৃশ্য দেখছি তা একেবারে অভাবিত ও অপূর্ব!

পশ্চিমদিকে পাহাড়ের উপর পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ভোরের আলোতে প্রাতঃস্নান করছে। পাহাড়গুলোর উপরে উদ্ভিদের চিহ্নমাত্র নেই কিন্তু তাদের তলাতেই অনাদিকালের নীল অরণ্য!

পূর্বদিকে মস্ত একটি প্রান্তর ধু-ধু করছে মাঝে মাঝে এক-একটা গাছের কুঞ্জ। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, অতবড় মাঠের কোথাও একগাছা ঘাসের নামগন্ধও নেই? মাঠের একপাশ দিয়ে একটা চিকচিকে রেখা এঁকেবেঁকে কোথায় চলে গেছে নিশ্চয়ই নদী।

উত্তরদিকেও বনজঙ্গল আর গাছপালা, অধিকাংশ গাছই ছোট ছোট, এবং তাদের আকার এমন অদ্ভুত যে পৃথিবীর কোনও গাছের সঙ্গেই মেলে না।

দক্ষিণদিকের গাছপালার ফাঁকে-ফাঁকে দেখা যাচ্ছে অনেক দূরে জলের উপরে সূর্য কিরণের ঝিকিমিকি। জলের নীল রং দেখে আন্দাজ করলুম সমুদ্র।

আমাদের পায়ের তলাতে যে জমি রয়েছে তা অত্যন্ত কঠিন, প্রায় পাথর বললেই চলে– সেখানেও ঘাসের চিহ্ন নেই। মাঝে-মাঝে এক একটা ঝোপের ভিতরে অজানা নানারকম আশ্চর্য ফুল ফুটে আছে সেসব ফুলের কোনওটারই আকার ছোট নয়। আর তাদের সকলেরই বোঁটায় বড় বড় কাটা!

বিমল কৌতূহলী চোখে চারিদিকে চাইতে-চাইতে বললে, কী আশ্চর্য বিনয়বাবু, এ আমরা কোন দেশে এলুম? এমন ভোরের বেলা, অথচ একটি পাখি পর্যন্ত ডাকছে না!

কুমার বললে, এমন বনজঙ্গল, অথচ একটা ফড়িং কি প্রজাপতি পর্যন্ত উড়ছে না!

বাস্তবিক, এ বড় অসম্ভব ব্যাপার! চারিদিকে কোথাও কোনও জীবের সাড়া বা চিহ্ন নেই।

আমি বললুম, এ যেন ময়নামতীর মায়াকানন! কমল বললে, সে আবার কী?

প্রাচীনকালে বাংলাদেশে মানিকচন্দ্র বলে এক রাজা ছিলেন। ময়নামতী তার রানি। প্রবাদ আছে ময়নামতী ডাকিনীবিদ্যা শিখে গুরুর বরে অমর হয়েছে। এখানে এসে আমার মনে হচ্ছে, এ যেন সেই ময়নামতীর মায়াপুরী কীটপতঙ্গ পশুপক্ষী পর্যন্ত ভয়ে এখানে দেখা দেয় না।

রামহরি এতক্ষণ সকলের আগে আগে পথ চলছিল, আমার কথা শুনেই সে মুখ শুকিয়ে সকলের পিছনে এসে দাঁড়াল।

আমি হেসে বললুম, কী হল হে রামহরি হঠাৎ পিছিয়ে পড়লে কেন?

আজ্ঞে, আপনার কথা শুনে।

কেন, কী কথা?

ওই যে বললেন এ বন হচ্ছে ময়নামতীর মায়াকানন। বুড়ি ময়নার গল্প আমিও জানি বাবু! সে বনকে শহর করত, শহরকে বন করত, ভেড়াকে মানুষ আর মানুষকে ভেড়া বানাত! যত ভূত-প্রেত আর ডাকিনী-যোগিনী তার কথায় উঠতবসত।

রামহরি, এত সহজে তুমি ভয় পাও কেন? আমি যা বললুম তা কথার কথা মাত্র!

ভয় কি পাই সাধে? যে বিপদ থেকে সবে পার পেয়েছি, আমি আর কিছুই অসম্ভব মনে করি না। কে জানে এ আবার কোন মুল্লুকে এলুম–পৃথিবীর সঙ্গে এর তো কিছুই মিলছে না। যেখানে পাখি নেই, প্রজাপতি নেই, ফড়িং নেই, সে কি পৃথিবী? এই শেষরাতে চোখের সমুখ দিয়ে পাহাড়ের মতো কী-একটা চলে গেল, পৃথিবীতে কি সেরকম কোনও জীব থাকে।

আমি আর কোনও জবাব দিলুম না। রামহরির ভয় হাস্যকর বটে, কিন্তু তার যুক্তি অসঙ্গত নয়। বিমল বললে, বিনয়বাবু আমাদের উড়োজাহাজ কোথায় এসে নেমেছিল, আমরা বোধ হয় তা আর ঠিক করতে পারব না।

আমি বললুম, আমারও তাই মনে হচ্ছে। অন্ধকারে আমরা কোথায় নেমেছিলুম এখন তা আর বোঝা শক্ত!

রামহরি দরদ ভরা গলায় বললে, আহা, উড়োজাহাজের ভেতরে যে মানুষগুলো ছিল, তাদের দশা কী হবে?

কমল বললে, যার অদৃষ্টে যা আছে! তাদের আবার মঙ্গল গ্রহে ফিরে যেতে হবে, আর কি!

কুমার বললে, এখন ওসব বাজে কথা রেখে নিজেদের কথা ভাব। আমাদের অদৃষ্টও খুব উজ্জ্বল বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু ওকি! বিমল, বিমল!

আমরা সকলেই স্পষ্ট দেখলুম, অল্পদুরেই বনের এক অংশ উপর থেকে তলা পর্যন্ত দুলছে। তার পরেই দেখা গেল, বনের উপরে চূড়ার মতো খুব-উঁচু একটা গাছ বারদুয়েক দুলেই মড়মড় শব্দে ভেঙে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিমল বিস্মিতভাবে বললে, অতখানি জায়গা জুড়ে বন দুলছে-কে ওখানে আছে।

কুমার বললে, এখন ঝড়ও নেই জোরে হাওয়া বইছে না। তবে অত বড় গাছ এত সহজে ভাঙলে কে?

বাঘা একবার ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠল, তারপর ছুটে সেই বনের ভিতর গিয়ে ঢুকল।

আমার গা কেমন শিউরে-শিউরে উঠতে লাগল। আমি বিজ্ঞানকে মানি এবং বিজ্ঞান যে অনেক অসম্ভব ব্যাপারকে সম্ভব করেছে তাও আমি জানি কিন্তু এখানে এসে যেসব কাণ্ড দেখছি তার কোনই হদিস পাচ্ছি না। এ আমাদের চোখের ভ্রম, মনের ভ্রম,না সত্যিই কোনও অলৌকিক ব্যাপার?

হঠাৎ দেখলুম বাঘা তিরের মতো বেগে বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। তার ল্যাজ পেটের তলায় গুটানো আর তার চোখ দুটো বিষম ভয়ে যেন ঠিকরে বেরিয়ে পড়তে চাইছে। সে এসেই বিমলের পায়ের তলায় মুখ খুঁজড়ে শুয়ে পড়ল।

বিমল তার মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে বললে, বাঘা তো কখনও ভয় পায় না। সে এমন কী দেখেছে?

আমি গম্ভীর স্বরে বললুম, বিমল, এ জায়গা বড় সুবিধের নয়। এসো, এখান থেকে আমরা চলে যাই-একটা মাথা গোঁজবার ঠাই খুঁজতে হবে তো!

বিমল একবার বাঘা, আর একবার বনের দিকে তাকিয়ে জড়িত স্বরে বললে, কিন্তু বনের ভিতরে কী আছে,বাঘা কী দেখে এত ভয় পেয়েছে?

.

বোম্বাই ফড়িং

আমরা সেই ভয়াবহ অরণ্য থেকে পালাবার জন্যে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হতে লাগলুম।

চলতে-চলতে বারবার পিছনে তাকিয়ে সেই একই দৃশ্য দেখলুম-বনের এক জায়গায় গাছপালা অত্যন্ত অস্বাভাবিকভাবে দুলছে আর দুলছে। কেন দুলছে, কে দোলাচ্ছে?

বাঘা আমাদের পায়ে পায়ে জড়িয়ে চলতে লাগল কিন্তু ভয়ে সে তখনও জড়সড় হয়ে আছে।

বনের ভিতরে কী যে বিভীষিকা লুকিয়ে আছে এবং বাঘা যে কী দেখে ভয়ে মুষড়ে পড়েছে, অনেক ভেবেও তার কোনও হদিস পেলুম না।

কুমার বললে, আমার বাঘা বাঘ দেখেও ভয় পায় না। কিন্তু এর অবস্থাই যখন এমন কাহিল হয়ে পড়েছে, তখন এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে যে বনের ভেতরে নিশ্চয়ই কোনও ভয়ঙ্কর কাণ্ড আছে!

বিমল দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, চুপিচুপি ওখানে গিয়ে আমি একবার দেখে আসব কি?

আমি তাড়াতাড়ি ডানপিটে বিমলের হাত চেপে ধরে বললুম, তুমি কি পাগল হলে বিমল? বিপদকে যেচে ডেকে আনবার কোনও দরকার নেই?

বিমল বললে, আচ্ছা আপনি যখন মানা করছেন তখন আর যাব না।

আমরা আবার অগ্রসর হলুম। আশেপাশে আরও অনেক ঝোপ-জঙ্গল আর বন রয়েছে। কেন জানি না, সেগুলোর পাশ দিয়ে যেতে-যেতে আমার বুকটা কেমন ছাৎ ছ্যাৎ করে উঠতে লাগল! প্রতি পদেই মনে হতে লাগল ওইসব বনজঙ্গলের মাঝখানে সাক্ষাৎ মৃত্যু যেন আমাদের অপেক্ষায় ওঁত পেতে বসে আছে। এক জায়গায় শুনতে পেলুম, বনের ভেতরে আবার সেইরকম ধপাস ধপাস করে শব্দ হচ্ছে এবং প্রতি শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীর বুক কেঁপে-কেঁপে উঠছে- বনের ভিতরে যেন কোনও পর্বতপ্রমাণ দানব আপন মনে এধারে ওধারে ঘুরে ফিরে চলাফেরা করে বেড়াচ্ছে। যার পায়ের শব্দেই পৃথিবী কঁপে, না জানি তার আকার কি ভয়ানক! একবার সে যদি মানুষের গন্ধ পায়, তাহলে আর কি আমাদের রক্ষা আছে?

আরব্য উপন্যাসের সিন্দবাদ একবার এক দৈত্যের কবলে গিয়ে পড়েছিল। গালিভার সাহেবের ভ্রমণ-কাহিনিতেও দৈত্য-মুল্লুকের কথা আছে। তবে কি সে সব গল্প কাল্পনিক নয়, আমরা কি সত্যই কোনও দৈত্যদের দেশে এসে পড়েছি? কিন্তু এ কথায় আমার মন বিশ্বাস করতে চাইলে না। বিমল বললে, বিনয়বাবু, আমরা তো কেউ এখানকার কিছুই চিনি না। কোন দিক নিরাপদ কী করে আমরা তা জানতে পারব?

.

বিমলের কথা সত্য। কিন্তু খানিকক্ষণ ভেবে বুঝলুম দক্ষিণ দিক অর্থাৎ যেদিকে সমুদ্র আছে, সেদিকটা বেশ ফাঁকা,-সেদিকে জঙ্গল নেই, কাজেই কোনও লুকানো বিপদেরও ভয় নেই। তার উপরে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে খুব বড় একটা পাহাড়ও রয়েছে। মঙ্গলগ্রহের মতো এখানেও আমরা ওই পাহাড়ের ভিতরে আশ্রয় নিতে পারব। সকলকে আমি সেই কথা বললুম। সকলেই আমার প্রস্তাবে রাজি হল। আমরা তখনই সেই পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হলুম।

পাখি নেই, প্রজাপতি নেই, মানুষের সাড়া নেই, চারিদিকে খালি বন আর পাহাড় আর সমুদ্র! আমার মনে হল, আমরা যেন বৈজ্ঞানিকদের পৃথিবীর সেই বাল্যকালে ফিরে এসেছি- যখন মানুষের নামও কেউ শোনেনি, যখন পৃথিবীতে বাস করত শুধু প্রকাণ্ড কিম্ভূতকিমাকার আশ্চর্য সব জানোয়ার!

আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, অনেক-অনেক উঁচুতে একঝাক পাখি উড়ে যাচ্ছে। তাহলে এদেশেও পাখি আছে। তাড়াতাড়ি আমি সকলের দৃষ্টি সেই দিকে আকর্ষণ করলুম।

বিমল বললে, কিন্তু ওগুলো কি পাখি?

কুমার বললে, চিল।

কমল বলল, ঈগল।

আমি বললুম, কিন্তু চিল কি ঈগলের ডানা তো অত বড় হয় না।

রামহরি বললে, ওদের ল্যাজ কীরকম দেখুন।

তাই তো, ওদের ল্যাজগুলো চতুষ্পদ জীবের মতো যে! কি পাখি ওগুলো?

ভালো করে দেখবার আগেই পাখির ঝাক ক্রমে দূরে মিলিয়ে গেল।

হঠাৎ পিছন থেকে কমল আর্তনাদ করে উঠল। চকিতে ফিরে দেখি কমলের পিঠের উপরে একটা অদ্ভুত আকারের জীব এসে বসেছে আর কমল প্রাণপণে সেটাকে পিঠ থেকে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করছে কিন্তু কিছুতেই পারছে না।

আমরা সকলে মিলে জীবটাকে মেরে ফেললুম। অদ্ভুত জীব? দেখতে মস্ত বড় একটা ফড়িংয়ের মতো প্রায় এক হাত লম্বা! কিন্তু তার মুখে সাঁড়াশির মতো দুখানা বড় বড় দাঁড়া রয়েছে আর তার দেহের দুই ধারেও রয়েছে দুখানা করে চারখানা হাত-দেড়েক লম্বা ডানা।

রামহরি বললে, ও বাবা এ যে বোম্বাই ফড়িং!

কমলের দিকে চেয়ে দেখলুম তার ঘাড়ের পিছনে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে।

কুমার হঠাৎ চেঁচিয়ে একদিকে আঙুল তুলে বললে, দেখো, দেখো!

সেই দিকে তাকাতেই দেখি গাছপালার ভিতর থেকে পালে পালে বোম্বাই ফড়িং বেরিয়ে আসছে।

আমি বললুম, পালাও, পালাও। ওরা আমাদের দেখতে পেলে আমরা কেউ বাঁচব না।

সবাই বেগে দৌড়োতে লাগলুম-ফড়িং দেখে এর আগে মানুষ বোধহয় আর কখনও পালায়নি।

.

পেটের ভাবনা

এই তো সমুদ্রতীর! উপরে নীলপদ্মের রং মাখানো অনন্ত আকাশ, নীচে পৃথিবী দেবীর পরনের নীলাম্বরীর মতো অনন্ত নীল সায়রের লীলা!

সমুদ্রের বুকের উপরে বসে সূর্যের আলো হাজার হাজার হিরা মানিক নিয়ে যেন ছিনিমিনি খেলছে, আমরা বসে বসে খানিকক্ষণ তাই দেখতে লাগলুম।

বিমল প্রথমে কথা কইলে। বললে, বিনয়বাবু, এখন উপায়?

কীসের উপায়?

আমরা যে পৃথিবীতেই এসেছি, তাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এ কোন দেশ, এখান থেকে কোন দিকে, কতদূরে মানুষের বসতি আছে, তা আমরা জানি না। এখানে থাকাও সম্ভব নয়, কারণ কি খেয়ে বেঁচে থাকব?

আমি বললুম, চেষ্টা করলে বনের ভেতরে শিকার মিলতে পারে। বিমল বললে, হা, মিলতে পারে, কিন্তু তাও বন্দুকের টোটা না ফুরানো পর্যন্ত।

বিমল, টোটা ফুরোবার আগেই আমরা যে এ-দেশ থেকে পালাবার পথ খুঁজে পাব না, এমন মনে করবার কোনও কারণ নেই।

কিন্তু শিকার পেলেও আমরা রাঁধব কী করে? আমাদের সঙ্গে দেশলাই নেই, আগুন জ্বালতে পারব না।

তা হলে আমাদের কাঁচা মাংস খাওয়াই অভ্যাস করতে হবে। মন্দ কি, সে-ও এক নতুনত্ব!

রামহরি বললে, বাবু ভয় নেই, আপনাদের কাঁচা মাংস খেতে হবে না, আমি আপনাদের রেঁধে খাওয়াব।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, তুমি কোথা থেকে আগুন পাবে?

রামহরি বললে, কেন ওই পাহাড়ের পাশ দিয়ে আসতে আসতে আপনারা কি দেখেননি কত ছোট-বড় চকমকি পাথর পড়ে রয়েছে।

আমি আশ্বস্ত হয়ে বললুম, যাক তাহলে আমাদের একটা বড় ভাবনা দূর হল। ইস্পাতের জন্যে ভাবতে হবে না, আমাদের সঙ্গে ছোরাছুরি আছে, তাই দিয়েই কাজ চালিয়ে নেব।

বিমল পেটের উপরে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, ও বিনয়বাবু, শুনেই যে আমার খিদে পেয়ে গেল। এখন খাই কি?

আমি হেসে বললুম, শিকার না পেলে আমাদের হাওয়া খেয়েই বেঁচে থাকবার চেষ্টা করতে হবে।

কুমার বললে, কেন বিনয়বাবু, খাবার তো আমাদের সামনে রয়েছে, হাত বাড়িয়ে নিলেই হয়!

বিমল বললে, সামনে! কোথায়?

কুমার বললে, ওই দেখো!

চেয়ে দেখলুম আমাদের সুমুখে বালির উপরে, অনেকখানি জায়গা জুড়ে হাজার হাজার গর্ত আর প্রত্যেক গর্তের সামনে বসে রয়েছে এক-একটা লাল রঙের কঁকড়া।

বিমল মহা উল্লাসে এক লাফ মেরে বলল, কী আশ্চর্য, এতক্ষণ আমি দেখতে পাইনি!

আমরা সকলেই কাঁকড়া ধরতে ছুটলুম। কিন্তু খানিকক্ষণ ছুটাছুটি করেই বুঝলুম, কাজটা মোটেই সহজ নয়। তাদের কাছে যেতে না যেতেই তারা বিদ্যুতের মতো গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ে, কিছুতেই ধরা দেয় না। তারা কেউ আত্মসমর্পণে রাজি নয় দেখে আমরা শেষটা গর্ত খুঁড়ে তাদের গোটাকতককে অনেক কষ্টে বন্দি করলুম। গর্ত খুঁড়তে খুঁড়তে কমল হঠাৎ একরাশ ডিম আবিষ্কার করলে। মোট একশোটা ডিম।

আমি সানন্দে বললুম, ব্যস আর আমাদের খাবারের ভাবনা নেই। এগুলো কাছিমের ডিম।

কমল বললে, কাছিমের ডিম কি মানুষে খায়?

নিশ্চয়ই খায়। দক্ষিণ আমেরিকার কোন স্থানে কাছিমের ডিম আর মাংসই হচ্ছে মানুষের প্রধান খাবার। এখানে যখন কাছিমের ডিম পাওয়া গেছে, তখন আজ রাত্রে আমরা কাছিমও ধরতে পারব।

বিমল বললে, তাহলে দেখা যাচ্ছে ভাগ্যদেবী এখনও আমাদের উপরে একেবারে বিমুখ হননি!

কুমার বলল, আর তো তর সইছে না–আগুন জ্বাল আগুন জ্বাল।

.

সাগর-দানবের পাল্লায়

পাহাড়ের উপরে এখানেও একটা গুহা খুঁজে নিতে আমাদের বেশি দেরি লাগল না। এ গুহাটির সবচেয়ে সুবিধা এই যে, এর ভিতরটা বেশ লম্বা-চওড়া হলেও মুখটা এমন ছোট যে হামাগুড়ি না দিয়ে ভিতরে ঢুকবার উপায় নেই। কাজেই আত্মরক্ষার পক্ষে গুহাটি খুবই উপযোগী।

সমুদ্রতীরে যেখানে কাছিমের ডিম পাওয়া গিয়েছিল, সন্ধ্যার পর আমরা আবার সেইখানে গিয়ে একখানা বড় পাথরের আড়ালে লুকিয়ে রইলুম কাছিম ধরবার জন্যে।

দক্ষিণ আমেরিকার যেভাবে কচ্ছপ শিকার করা হয়, আমি কেতাবে তা পড়েছি। কচ্ছপদের স্বভাব হচ্ছে, ডাঙায় উঠে বালির ভিতরে ডিম পাড়া। রাত্রে দলে দলে তারা ডাঙায় ওঠে। স্ত্রীকচ্ছপ ডিম পেড়ে বালির ভিতর লুকিয়ে রাখে। এক-একটা কচ্ছপ একসঙ্গে আশি থেকে একশো-বিশটা পর্যন্ত ডিম পাড়ে। তারপর ভোর হওয়ার আগেই আবার তারা জলে ফিরে যায়।

শিকারিদের কাজ হচ্ছে কচ্ছপদের ধরে উলটে দেওয়া! তা হলে আর তারা পালাতে পারে না। উলটে দেওয়ার সময় একটু সাবধান হওয়া দরকার যাতে কাছিমের ডানা বা মুখের কাছে শিকারি হাত না পড়ে। কচ্ছপের কামড় বড় সুখের নয়, আর তার ডানার আঘাতও এমন জোরালো যে এক আঘাতে মানুষের পায়ের হাড় মট করে ভেঙে যায়।...এই সব কথা আমি সবাইকে বুঝিয়ে দিতে লাগলুম।

আকাশে তখন একফালি চাঁদ দেখা দিয়েছে, কিন্তু তার আলো এত ক্ষীণ যে, অন্ধকার দূর হচ্ছে না। যে ভয়ানক বন থেকে আমরা পালিয়ে এসেছি অনেক দূরে একটা জমাট কালো ছায়ার মতো তাকে দেখা যাচ্ছে। তার দিকে যতবার তাকাই আমাদের বুক অমনি দুরুদুরু করে উঠে। ও বনে যে কী আছে ভগবান তা জানেন!

এমন সময়ে সাদা বালির উপরে একটা কালো রেখা টেনে, প্রকাণ্ড একটা কচ্ছপ আমাদের খুব কাছে এসে চারিদিকে একপাক ঘুরে এল।

বিমল তাকে তখনই ধরতে যাচ্ছিল আমি বাধা দিয়ে চুপিচুপি বললুম, থাম থাম! ওটা হচ্ছে কাছিমদের কর্তা। ও আগে এসে চারিদিকে গণ্ডি কেটে রেখে যাচ্ছে। কর্তা গিয়ে খবর দিলে পর আর সব কাছিম এসে এই গণ্ডির ভেতরে আড্ডা গাড়বে। তারপর আমরা আক্রমণ করব।

রামহরি বললে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই যে কাছিম-ভায়া ফিরে যাচ্ছেই তো বটে।

আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না, কাছিমকর্তা ফিরে যাওয়ার পরেই দলে-দলে ছোট বড় কচ্ছপ ডাঙার উপরে এসে উঠল।

তারপরেই আমাদের আক্রমণ। আমরা বেগে গিয়ে তাদের এক একটাকে ধরে বালির উপরে চিত করে ফেলে দিলুম। কাজটা অবশ্য খুব সহজ নয়, কারণ তাদের অনেকেই ওজনে প্রায় একমণ, কি আরও বেশি।

আমরা প্রায় গোটা দশেক কচ্ছপ বন্দি করলুমবাকিগুলো জলে পালিয়ে গেল। আগেই কতকগুলো শুকনো লতা সংগ্রহ করে এনেছিলুমবন্দিদের বাঁধবার জন্যে। সেই লতা দিয়ে আমরা তখনই তাদের বেঁধে ফেললুম।

বিমল বললে, যাক এখন কিছুদিনের জন্যে আমাদের পেটের ভাবনা আর রইল না। এইবারে এ-দেশ থেকে পালাবার কথা ভাবতে হবে!

বিমলের কথা শেষ হতে না হতেই ভীষণ এক বিকট চিৎকারে সমস্ত পৃথিবী যেন পরিপূর্ণ হয়ে গেল! উঃ তেমন উচ্চ চিৎকার আমি জীবনে আর কখনও শুনিনি-যেন হাজারটা সিংহ একসঙ্গে একস্বরে গর্জন করে উঠল।

সে অমানুষিক চিৎকারে আমাদের সমস্ত শরীর এলিয়ে পড়ল, কেউ আমাদের আক্রমণ করলেও তখন আমরা সেখান থেকে এক পা নড়তে পারলুম না।

আবার-আবার-আবার-সেই আকাশ-ফাটানো গর্জন, একবার, দুইবার, তিনবার।

সমুদ্রের জল থেকে কী ওটা উঠে আসছে কী ওটা কী ওটা?

অস্পষ্ট আলোয় তাকে ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু তার মাথা প্রায় তালগাছের সমান উঁচু, আর তার দেহের তুলনায় হাতির দেহও বিড়ালের সামনে নেংটি ইঁদুরের মতো নগণ্য। সেই ভয়ানক সমুদ্র-দানবের চোখ দুটো আলো-আঁধারির মধ্যে অগ্নিশিখার মতো জ্বলে জ্বলে উঠছে।

আমি সভয়ে বললুম, পালাও, পালাও।

বিমল কাতর স্বরে বললে, আমার পা-দুটো যে অসাড় হয়ে গেছে, পালাবার যে উপায় নেই।

রামহরি একটা আর্তনাদ করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

কুমার আর কমল দুই হাতে কান চেপে বালির উপরে বসে পড়ল।

আমার দুই চোখ যেন অন্ধ হয়ে গেল।

এখন উপায়?

.

ডিটপ্লোডোকাস?

জলের ভিতর থেকে সেই সৃষ্টিছাড়া জীবটা যখন প্রথম মাথা তুললে, তখন তাকে মনে হল একটা বিষম মোটা অজগর সাপের মতো। কিন্তু এক মুহূর্ত পরেই আবছায়ার মতো দেখা গেল তার বিরাট দেহ। তার চারটে পা এবং পা-গুলো তার দেহের তুলনায় খুব ছোট হলেও প্রত্যেক পা-খানা অন্তত ছয়-সাত ফুটের চেয়ে কম উঁচু হবে না।

আমরা স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলুম সেই সাগর-দানব ডাঙায় উঠে তার প্রায় পঁচিশ-তিরিশ ফুট লম্বা ল্যাজ বারকতক বালির উপরে আছড়ালে, তারপর হঠাৎ নিজের হাতির চেয়ে দ্বিগুণ লম্বা, চওড়া ও উঁচু দেহের উপরে একটা বিশফুট লম্বা অজগরের মতো গলা শূন্যে তুলে আবার তেমনি বাজের মতো চিৎকার করতে লাগল। সেসময় তার মাথাটা এত উর্ধ্বে উঠল যে পাশে কোনও তিনতালা বাড়ি থাকলেও তার ছাদের উপর থেকে সে অনায়াসে শিকার ধরতে পারত।

তার ভীষণ চিৎকারে রামহরির মূর্ছা আপনি ছুটে গেল। সে চিৎকারে মৃতের চিরনিদ্রাও বোধহয় ভেঙে যায়। রামহরির মূর্ছা তো সামান্য কথা!

তবু আমরা কেউ পালাতে পারলুম না–যেন এক অসম্ভব দুঃস্বপ্ন দেখে আচ্ছন্নের মতো দাঁড়িয়ে রইলুম।

তারপরেই আচম্বিতে চিৎকার থামিয়ে সেই ভীষণ জীবটা ঝপাং করে আবার সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল–দেখতে-দেখতে দেহের সমস্তটা আবার অদৃশ্য হয়ে গেল, জলের উপরে জেগে রইল শুধু তার অজগরের মতো মাথা এবং গলার খানিকটা। ওই মাথা ও গলার তলায় যে কি প্রকাণ্ড ও অদ্ভুত দেহ আছে তাকে তখন দেখলে কেউ তা কল্পনা করতে পারত না।

.

এতক্ষণে আমাদের সাড় হল। আমি বললুম, জীবটা বোধকরি আমাদের দেখতে পায়নি,–এইবেলা পালাই চলো।

তারপরেই আমরা সবাই একসঙ্গে তিরের মতো পাহাড়ের দিকে ছুট দিলুম–একেবারে গুহার সামনে না গিয়ে দাঁড়াতে ভরসা করলুম না। বিমল রুদ্ধশ্বাসে বললে, বিনয়বাবু একি দেখলুম।

আমিও তাই ভাবছি।

রামহরি দুই হাত কপালে চাপড়ে বললে, আর ভেবে কি হবে, এখানে আর আমাদের নিস্তার নেই।

কুমার হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞাসা করলে, বিনয়বাবু মঙ্গল ছাড়া আর কোনও গ্রহে কি জীবের বসতি আছে?

আমি বললুম, থাকতেও পারে।

আমরা তাহলে অন্য কোনও গ্রহে এসে পড়েছি।

কেন তুমি এ অনুমান করছ?

পৃথিবীতে এরকম জীবের কথা কেউ কখনও শুনেছে?

কমল বললে, উঃ! ভাবতেও আমার বুক ঢিপঢিপ করছে।

আমি বললুম, আমরা যে পৃথিবীতে এসেছি, তাতে আর কোনওই সন্দেহ নাই। এরকম সাগর-দানবের কথা আমরা আর কখনও শুনিনি বটে, কিন্তু এই বিপুলা পৃথিবীর কোথায়। কি আছে, মানুষ তার সব রহস্য তো জানে না। তবে যে-জীবটাকে আমরা এখনি দেখলুম, এটি নিশ্চয়ই প্রাগৈতিহাসিক জীব। প্রাগৈতিহাসিক কি জানো তো? যে-যুগের ইতিহাস পাওয়া যায় না, সেই-যুগকে ইংরাজিতে Prehistoric যুগ বলে। এই Prehistoric কথাটিকে বাংলায় বলে প্রাগৈতিহাসিক।

বিমল বললে, হ্যাঁ, সে-যুগের কথা আমি কেতাবে পড়েছি। পৃথিবীর সেই আদিম যুগে, যখন মানুষেরও জন্ম হয়নি, তখন জলে, স্থলে, আকাশের নানান অদ্ভুত আকারের জীবজন্তু বিচরণ করত। তখনকার অনেক জলচর আর স্থলচর জীবের আকার ছিল ছোটখাটো পাহাড়েরই মতো বড়। তাদের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কঙ্কাল এখনও মাটি খুঁড়লে পাওয়া যায়। কিন্তু বিনয়বাবু, সেসব জীব তো মানুষ জন্মাবার আগেই পৃথিবী থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে?

আমি বললুম, এ কথা জোর করে বলা যায় না। পৃথিবীতে এখনও এমন অনেক স্থান আছে, মানুষ যেখানকার কথা কিছুই জানে না। সেসব জায়গায় কি আছে আর কি না আছে, কে তা বলতে পারে? মাঝে মাঝে ভ্রমণকারীদের বর্ণনায় পড়া যায়, পৃথিবীর স্থানে স্থানে কেউ কেউ সেকেলে জানোয়ারদের মতো অসম্ভব আকারের জানোয়ার স্বচক্ষে দর্শন করেছে। সে কথা অনেকেই বিশ্বাস করেন না বটে, কিন্তু কথাটা যে মিথ্যা এমন প্রমাণও তো নেই। এই যে আমরা আজ একটা অদ্ভুত জীব দেখলুম, এটাকে তো চোখের ভ্রম বলে উড়িয়ে দেওয়া চলবে না। প্রাগৈতিহাসিক বা সেকেলে জীবদের অনেক কাহিনি আমি পড়েছি। সেকালে ডিপ্লোডোকাস বলে এক প্রকাণ্ড জানোয়ার ছিল। আজ যে সাগর-দানবকে আমরা দেখেছি। তার সঙ্গে ওই ডিপ্লোডোকাসের চেহারা আশ্চর্যরকম মিলে যায়। কিন্তু আজ অনেক রাত হয়েছে, এসব কথা এখন থাক। ভেবেচিন্তে এসম্বন্ধে আমার

যা ধারণা পরে তা তোমাদের কাছে জানাব। এখন এসো, ঘুমের চেষ্টা করে দেখা যাক গে।

.

আবার বিপদ

পরদিন সকালবেলায় আমরা ভয়ে ভয়ে আবার সমুদ্রের ধারে গেলুমবন্দি কচ্ছপগুলোকে ধরে আনবার জন্যে।

সৌভাগ্যের কথা, সাগর-দানবের আর কোনও উদ্দেশ পাওয়া গেল না। কেবল যে স্থানে দাঁড়িয়ে সে লাঙ্গুল আস্ফালন করেছিল সেখানটায় দেখা গেল বালির ভিতরে মস্ত একটা গর্ত হয়েছে। সেই গর্তের ভিতরে অনায়াসেই দশ-বারো জন লোককে কবর দেওয়া যায়। যার ল্যাজেই এত জোর, তার গায়ের জোর যে কত, আমরা তা কল্পনাও করতে পারলুম না।

বালির উপরে সাগর-দানবের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পায়ের দাগও আমাদের চোখে পড়ল।

হঠাৎ কমল বলে উঠল, একী! মোটে তিনটে কচ্ছপ রয়েছে। অন্যগুলো গেল কোথায়?

মোটে তিনটে কচ্ছপ! বেশ মনে আছে দশটা কচ্ছপ ধরে ছিলুম। তারা যে বাঁধন খুলে সমুদ্রে পালায়নি তাতে আর কোনওই সন্দেহ নেই। কারণ তাদের পিঠের শক্ত খোলগুলো ভাঙাচোরা অবস্থায় সেখানেই ছড়িয়ে পড়ে ছিল, কোনও জীব এসে যে তাদের মাংস খেয়ে গেছে, এটা বুঝতে আমাদের কিছুমাত্র বিলম্ব হল না।

আমি ভাবলুম নিশ্চয়ই এ সাগর-দানবের কীর্তি।

কিন্তু বিমল চেঁচিয়ে বললে, বিনয়বাবু, বিনয়বাবু দেখে যান।

বিমলের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই সে নীচের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলে। চেয়ে দেখলুম বালির উপরে বড় বড় পায়ের দাগ।

বিমল বললে, দেখছেন, এগুলো সাগর-দানবের পায়ের দাগ নয়।

হ্যাঁ এ পায়ের দাগ একেবারে অন্যরকম। তবে এ-ও নিশ্চয় আর একটা বিরাট দেহ দানবের পদচিহ্ন কারণ প্রত্যেকটি পায়ের দাগ লম্বায় অন্তত তিনফুটের চেয়ে কম নয়। উঃ, না জানি এ জীবটার আকার কী প্রকাণ্ড। প্রতি চারটে করে পায়ের দাগের মাঝখানে আবার আর একটা করে লম্বা-চওড়া অদ্ভুত দাগ রয়েছে! ভালো করে দেখে বুঝলুম এটা সেই অজানা দানবেরই বিপুল লাঙ্গুলের চিহ্ন।

বিমল সেই পায়ের দাগ অনুসরণ করে অগ্রসর হল। রামহরি, কুমার আর কমলকে সেখানেই অপেক্ষা করতে বলে আমিও বিমলের পিছনে-পিছনে চললুম।

যেতে-যেতে বিমল বললে, বিনয়বাবু যার পায়ের দাগ আমরা দেখছি সেই-ই নিশ্চয়। কচ্ছপগুলোকে খেয়ে ফেলেছে।

আমারও তাই বিশ্বাস।

কিন্তু অত বড় বড় সাত-সাতটা কচ্ছপ একসঙ্গে খাওয়া তো যে সে জীবের কর্ম নয়!

তা তো নয়ই। কিন্তু তুমি কোথায় যাচ্ছ বিমল?

জীবটা কোথায় থাকে তাই দেখতে। কোন দিক থেকে বিপদ আসবার সম্ভাবনা সেটা। জেনে রাখা ভালো।

আমি আর কিছু না বলে বিমলের সঙ্গে-সঙ্গে যেতে লাগলুম।

আমরা প্রায় এক মাইল পথ পার হয়ে এলুম! পায়ের দাগের রেখা তখনও ঠিক সমানই চলেছে! খানিক তফাতেই একটা ছোটখাটো বন রয়েছে, পায়ের দাগ গেছে সেই দিকেই।

আমি বললুম, বিমল, জন্তুটা যে ওই বনের ভেতরেই থাকে তো বেশ বোঝা যাচ্ছে, আমাদের আর অগ্রসর হওয়ার দরকার নেই।

বিমল কি একটা জবাব দিতে গিয়ে হঠাৎ থেমে পড়ল, তারপর বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে একদিকে তাকিয়ে রইল।

একটু দূরেই হাড়গোড় ভাঙা দ-য়ের মতো একটা গাছ একলা দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং তারই তলায় বসে বিচিত্র এক জানোয়ার তাকিয়ে আছে আমাদের দিকেই।

চোখের সামনে দেখলুম যেন ভীষণতার জীবন্ত প্রতিমূর্তি! এ জীব যেন ভগবানের সৃষ্টির বাইরেকার! তার মুখখানা অনেকটা কুমিরের মতো, সামনের পা দুটো ছোট, পিছনের পা দুটো বড়, আর তার মোটাসোটা ল্যাজটা দেখতে কাঙারুর মতো।

তার দেহ অন্তত ত্রিশ হাতের চেয়ে কম হবে না!

হঠাৎ সে ল্যাজ আর পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল, তারপর বিকট এক অপার্থিব চিৎকার করে ঠিক কাঙারুর মতোই মারলে এক লাফ! অতবড় দেহ নিয়ে কোনও জীব যে অমন করে লাফ মারতে পারে, না দেখলে আমি তা বিশ্বাস করতে পারতুম না।

বিমল সভয়ে বলে উঠল, ও যে আমাদের দিকেই আসছে। পালান-পালান!

আমরা দুজনে প্রাণপণে ছুটলুম-আর সেই কুমির কাঙারুও ঠিক তেমনি করেই শূন্যে লাফ মারতে মারতে আমাদের অনুসরণ করলে। মাঝে-মাঝে তার ভীষণ চিৎকার শুনে আমার গায়ের রক্ত যেন জল হয়ে যেতে লাগল।

.

বিমলের বীরত্ব

আমরা দুজনেই ছুটছি, আর ছুটছি।

আমাদের পিছনে লাফাতে-লাফাতে আসছে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মতো সেই ভয়ানক জানোয়ারটা!

প্রতি লক্ষ্যেই সে আমাদের বেশি কাছে এসে পড়ছে।

ছুটতে ছুটতে চেয়ে দেখলুম, তার সেই কুমিরের মতো প্রকাণ্ড মুখখানা একবার খুলছে আর একবার বন্ধ হচ্ছে এবং তার ভিতর থেকে দেখা যাচ্ছে, লাল টকটকে হলহলে একখানা জিভ ও দুইসার দাঁত! অত বড় দেহের পক্ষে তার চোখ দুটো খুব ছোট বটে, কিন্তু কি কুর, কি নিষ্ঠুর সেই চোখের দৃষ্টি!

হঠাৎ কীসে হোঁচট খেয়ে আমি ঘুরে পড়ে গেলুম। দারুণ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে তখনই আমি দাঁড়িয়ে উঠলুম বটে, কিন্তু ছুটতে গিয়ে আর ছুটতে পারলুম না।

বিমলও দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, ও কী বিনয়বাবু হল কি?

যাতনায় মুখ বিকৃতি করে আমি বললুম, আমি আর ছুটতে পারছি না বিমল! আমার ডান পা মুচড়ে একেবারে এলিয়ে পড়েছে।

বিমল সভয়ে বললে, তা হলে উপায়?

আমি আবার পিছনে চেয়ে দেখলুম। সেই দানবটা তখন একেবারে আমাদের কাছে এসে পড়েছে, আর কয়েকটা লাফ মারলেই সে একেবারে আমাদের ঘাড়ের উপরে এসে পড়বে।

আমি প্রাণের আশা জলাঞ্জলি দিয়ে বললুম, বিমল, শিগগির পালাও।

বিমল বললে, আপনাকে এখানে ফেলে? এমন কাপুরুষ আমি নই।

বিমল, বিমল, আমার জন্যে তুমি মরবে কেন? এখনও সময় আছে, এখনও পালাও।

বিমল দৃঢ়স্বরে বললে, মরতে হয়তো দুজনেই একসঙ্গে মরব, কিন্তু আপনাকে ফেলে কিছুতেই আমি পালাতে পারব না-এই বলেই সে বন্দুক তুলে ফিরে দাঁড়াল।

তার অদ্ভুত সাহস ও বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে আমি বললুম, কিন্তু, বিমল, তোমার ওই সামান্য বন্দুকের গুলিতে এতবড় ভীষণ জন্তুর কোনও ক্ষতি হবে না,-এখনও পালাও, নইলে আমরা দুজনেই একসঙ্গে মরব।

দেখা যাক বলে সে বন্দুকের লক্ষ্য স্থির করতে লাগল।

সেই ভয়াবহ কুমির কাঙারু তার পিছনের দুই পা ও ল্যাজে ভর দিয়ে লাফের পর লাফ মারতে মারতে তখনও এগিয়ে আসছে। সেই অতি বিপুল দেহের উপরে একটা পাহাড় ভেঙে পড়লেও তার কোনও আঘাত লাগে কিনা সন্দেহ, বিমলের এতটুকু বন্দুকের গুলিতে তার আর কি অনিষ্ট হবে?

এ যাত্রা আর বোধহয় রক্ষা নেই-আমি তো মরবই, আমার জন্যে বিমলকেও প্রাণ দিতে হবে!

ভাবছি, এমন সময়ে বিমলের বন্দুক গর্জন ও অগ্নি উদ্গার করলে।

সঙ্গে সঙ্গে দানবটাও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বিমল আবার বন্দুক ছুড়লে।

দানবটা আকাশের দিকে মুখ তুলে বজ্রনাদের মতো দুইবার গর্জন করলে, তারপর লাফাতে লাফাতে আবার যে-পথে এসেছিল সেইদিকেই বেগে পলায়ন করতে লাগল।

বিমল মহা উল্লাসে বলে উঠল, বিনয়বাবু, আর আমাদের ভয় নেই।

আমি হাত বাড়িয়ে তাকে বুকের ভিতরে টেনে নিয়ে বললুম, বিমল, তোমার সাহসেই আমাদের প্রাণ রক্ষা হল।

বিমল বললে, কিন্তু দুটো গুলি খেয়ে ওই জানোয়ারটা যদি ভয় পেয়ে না পালাত তাহলে আমরা কেউই বাঁচতুম না। আপনি ঠিক কথাই বলছেন, বন্দুকের গুলিতে ওর বিশেষ কিছুই ক্ষতি হবে না।

আমি বললুম, কিন্তু ওকে দেখে বুঝতে পারছ কি, ও একালের জীব নয়। প্রাগৈতিহাসিক কালের যে যুগকে পণ্ডিতরা সরীসৃপ-যুগ বলেন, এর আকার সেই যুগের জীবের সঙ্গে অবিকল মিলে যাচ্ছে। বিমল, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা পৃথিবীর এমন কোনও স্থানে এসে পড়েছি, যেখানে কোনও অজানা কারণে পৃথিবীর সেকালের জীবরা এখনও বর্তমান আছে। এ এক অভাবিত আবিষ্কার! এ সংবাদ জানতে পারলে সারা পৃথিবীতে মহা আন্দোলন জেগে উঠবে!

বিমল বললে, কিন্তু এই আবিষ্কারের বার্তা নিয়ে আমরা কি আবার সভ্য জগতে ফিরে যেতে পারব?

আমি বললুম, আজ যে জীবটার বিরুদ্ধে তুমি একাই দাঁড়াতে ভরসা করলে, ও জীবটা যদি হঠাৎ পৃথিবীর কোনও শহরে গিয়ে হাজির হয় তবে ওর ভয়ংকর মূর্তি দেখে শহরশুদ্ধ লোক নিশ্চয়ই শহর ছেড়ে পলায়ন করবে। তোমার মতো বীর যখন আমাদের মধ্যে আছে, তখন আমরা এদেশ থেকে বিজয়ীর মতো ফিরতে পারব না কেন বিমল?

বিমল সলজ্জ কণ্ঠে বললে, বিনয়বাবু আপনি বারবার ওই কথা তুলে আমাকে লজ্জা দেবেন না। দেখি আপনার পায়ের কোনখানটা মুচকে গেছে?

.

গরুড় পাখি

সেদিন গুহায় ফিরে এসে দেখলুম, কুমার, কমল আর রামহরি রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে আছে।

রামহরি ভিজে মাটির তাল দিয়ে কতকগুলি ছোট-বড় পাত্র তৈরি করে সেগুলোকে পুড়িয়ে শক্ত করে নিয়েছিল। উনুন তৈরি করতেও ভোলেনি। সমুদ্রের জল যখন আছে, তখন লবণেরও অভাব হয়নি। কাজেই অন্য কোনও মশলা না থাকলেও এত বিপদের পরে কচ্ছপের সিদ্ধ মাংস আর ডিম আজ বোধহয় নিতান্ত মন্দ লাগবে না!

সত্যিই মন্দ লাগল না। বেশি আর কি বলব, রামহরির রান্না আজ এত ভালো লাগল যে আমার মনে হল শহরে নিশ্চিন্ত ভাবে বসেও এর চেয়ে ভালো সুস্বাদু খাবার আর কখনও খাইনি।

দিনতিনেক আমরা কেউ আর পাহাড় থেকে নীচে নামলুম না, বেশিরভাগ সময়েই গুহার ভিতর বসে-বসে গল্পগুজবে আর পরামর্শেই কাটিয়ে দিলুম।

আজ বৈকালে আমরা ঠিক করলুম, পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু শিখরে উঠে দেখে আসব, যে-দেশে আমরা এসে পড়েছি তার চারিদিকের দৃশ্য কীরকম দেখতে!

যথাসময়ে উপত্যকার ভিতর দিয়ে আমরা পাহাড়ের উপরে উঠতে শুরু করলুম। তখনও আমার পায়ের ব্যথা সারেনি, কাজেই বেশ কষ্ট হতে লাগল। কিন্তু সে কষ্ট মুখে প্রকাশ করলুম না।

প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে, উপত্যকার গর্ভ ছেড়ে আমরা পাহাড়ের একটা উঁচু শিখরের উপরে গিয়ে দাঁড়ালাম।

চারিদিকে চেয়ে দেখলুম, সমস্ত দেশটা আমাদের পায়ের তলায় ঠিক যেন রিলিফ ম্যাপের মতো পড়ে রয়েছে।

সর্বপ্রথমই একটি সত্য আমাদের চোখের সামনে জেগে উঠল। আমরা যেখানে এসে পড়েছি, সেটি একটি দ্বীপ। কারণ পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ,–আমাদের সব দিকেই আকাশের সীমারেখা পর্যন্ত অনন্ত সাগরের নীল জল খেলা করছে!

দ্বীপের প্রায় পূর্বদিকে সেই বিশাল ও নিবিড় বন–যেখানে এসে আমরা প্রথমে অবতীর্ণ হয়েছিলুম। আমরা বেশ বুঝলুম, দ্বীপের সমস্ত বিভীষিকা ওই নিবিড় অরণ্যের ভিতরেই লুকানো আছে, কিন্তু এখান থেকে তার সুন্দর শ্যামলতা ছাড়া আর কিছুই আমাদের নজরে পড়ল না।

অরণ্যের একপাশে মস্ত একটা হ্রদ। তার তীরে তীরে নানাজাতীয় পাখি বিচরণ করছে। দূর থেকে সেগুলো কি পাখি, তা কিন্তু বোঝা গেল না।

বিমল উৎসাহভরে বললে, কালকেই আমি বন্দুক নিয়ে ওখানে গিয়ে দু-একটা পাখি শিকার করে আনব।

কুমার হেঁট হয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে বললে, দেখো দেখো, এখানে আবার কি একটা বিটকেল জীব বসে আছে!

পাহাড়ের ধারে গিয়ে দেখি, আমাদের ঠিক নীচেই চারটে অদ্ভুত আকারের জীব পাথরের মূর্তির মতো নিথর হয়ে চুপ করে পাশাপাশি বসে আছে। তাদের গায়ের রং ধূসর, চোখগুলো ভঁটার মতো গোল গোল, রক্তবর্ণ। তাদের আকার প্রায় পাঁচ ছয় ফুট লম্বা এবং তাদের দেহের দুপাশে দুখানা করে ডানা ও তলার দিকে একটা দড়ির মতো ল্যাজ ঝুলছে! মুখ দেখলে তাদের পাখি বলেই মনে হয় বটে, কিন্তু কারুর গায়েই পালকের চিহ্নমাত্র নেই। তাদের দেখতে এমন বীভৎস যে, আমার বুকের কাছটা থরথর করে কেঁপে উঠল।

হঠাৎ তারাও আমাদের দেখতে পেলে। বিশ্রী এক চিৎকার করে তারা তখনই ডানা ছড়িয়ে উড়তে শুরু করলে। তাদের দুই ডানার বিস্তার অন্তত পনেরো হাতের কম হবে না–

আমার মনে হতে লাগল, যেন এক-একটা চতুষ্পদ প্রকাণ্ড জন্তু চার পায়ে ডানা বেঁধে শূন্যে উড়ছে। তাদের দীর্ঘ চঞ্চুর ভিতর থেকে ধারালো ও বড় বড় দাঁতের সারিও আমরা স্পষ্ট দেখতে পেলুম।

রামহরি বলে উঠল, এ কি গরুড় পাখি?

রামহরির নাম দেওয়ার শক্তি আছে বটে! এই কিম্ভুতকিমাকার উড়ন্ত জীবগুলোকে সত্য সত্যই অনেকটা গরুড়ের মতোই দেখাচ্ছিল।

প্রথমটা তারা আমাদের মাথার উপর চক্র দিয়ে একবার ঘুরে গেল,-তারপর হঠাৎ তাদের একটা তিরের মতো নীচের দিকে ঝাঁপ দিলে।

আমরা সাবধান হওয়ার আগেই সে হুস করে বিমলের ঘাড়ের উপরে এসে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার প্রকাণ্ড ডানা ও দেহের ধাক্কায় বিমল পাহাড়ের একদিকে ঠিকরে চিত। হয়ে পড়ে গেল।

কাছেই কুমার ছিল, সে তার বন্দুকের কুঁদো দিয়ে সেই জীবটার গায়ের উপরে এক ঘা বসিয়ে দিলে। জন্তুটা কর্কশ চিৎকারে চারিদিক কাঁপয়ে সেই মুহূর্তে ফিরে তাকে আক্রমণ করলে, কুমার আবার তাকে মারবার জন্যে বন্দুক তুললে, সে কিন্তু তার আগেই কুমারের একখানা হাত কামড়ে ধরলে এবং চোখের পলক না ফেলতেই কুমারকে মাটি থেকে টেনে তুলে শূন্যের দিকে উঠল।

এত শীঘ্র ব্যাপারটা ঘটল যে, আমরা সাহায্য করবার জন্যে একখানা হাত পর্যন্ত তোলবার সময় পেলুম না।

কুমার আর্তনাদ করে উঠল, বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও!

.

উড়ন্ত সরীসৃপ

ঠিক আমার মুখ দিয়েই কুমারের দেহটা শূন্যে উঠে যেতে লাগল!

কুমার আবার আর্তস্বরে চিৎকার করলে, বাঁচাও, বাঁচাও!

আমার বিস্ময়ের চমকটা ভেঙে গেল। তখনও কুমারের দেহ নাগালের বাইরে গিয়ে পড়েনি সামনের দিকে একলাফে এগিয়ে হাত বাড়াতেই আমি কুমারের পা দুটো মুঠোর ভিতরে পেলুম এবং প্রাণপণে তাই ধরে টানতে লাগলুম।

কিন্তু এই গরুড় পাখির গায়ে কি ভয়ানক জোর! সে কুমারের সঙ্গে আমাকেও প্রায় উপরে টেনে তোলবার উপক্রম করলে ভাগ্যে আমি বাম হাতে পাহাড়ের একটা গাছের ডাল চেপে ধরে আর ডান হাতে কুমারের পা ধরে দেহের সমস্ত শক্তি এক করে টানতে লাগলুম, নইলে আমাকেও কম মুশকিলে পড়তে হত না।

এদিকে আবার বিপদের উপর নতুন বিপদ! আমি যখন কুমারকে আর নিজেকে নিয়ে এমনি বিব্রত হয়ে আছি, তখন আর একটা গরুড় পাখি হঠাৎ তিরের মতো আমার উপরে ছোঁ মেরে পড়ল। সে তার প্রকাণ্ড ডানা দিয়ে আমাকে এমন প্রচণ্ড এক ঝাঁপটা মারলে যে, কুমারের পা তো আমার হাত থেকে ফসকে গেল বটেই, তার উপরে আমি নিজেও দুই চোখে সর্ষেফুল দেখে তিন-চার হাত দূরে ছিটকে গিয়ে পড়লুম।

সেই সঙ্গেই গুড়ুম করে বন্দুকের আওয়াজ হল।

তাড়াতাড়ি উঠে বসে দেখি খানিক তফাতেই একটা গরুড় পাখি দুই ডানা ছড়িয়ে পাহাড়ের উপরে নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে আছে এবং তার পাশেই রয়েছে কুমারের দেহ। সে দেহ মড়ার মতো স্থির।

বিমল আর রামহরি তাড়াতাড়ি কুমারের কাছে ছুটে গেল। বিমল তাকে পরীক্ষা করে বললে, না, কোনও ভয় নেই। কেবল অজ্ঞান হয়ে গেছে।

মাথার উপরে তাকিয়ে দেখলুম, বাকি তিনটে গরুড় পাখি তখনও শূন্যে চক্র দিয়ে আমাদের কাছে কাছেই ঘুরছে ফিরছে।

কুমারের বন্দুকটা আমার সামনেই পড়েছিল আমি তখনি সেটা তুলে নিয়ে লক্ষ্য স্থির করে ঘোড়া টিপলুম। লক্ষ্য ব্যর্থ হল না! আর একটা পাখি ঘুরতে ঘুরতে নীচে পড়ে পাহাড়ের ভিতর কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। বাকি পাখি দুটো ভয় পেয়ে বিশ্রী চিৎকার করতে করতে ক্রমেই উপরে উঠে যেতে লাগল।

খানিক পরেই কুমারের জ্ঞান হল। গরুড় পাখির কামড়ে তার বাম হাতখানা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল, এছাড়া তার আর বিশেষ কিছু অনিষ্ট হয়নি।

বিমল মরা গরুড় পাখিটার দিকে অনেকক্ষণ ধরে অপলক চোখে তাকিয়ে থেকে বললে, কী আশ্চর্য জীব!

আশ্চর্য জীবটা! অতি বড় দুঃস্বপ্নেও এমন কিম্ভুতকিমাকার চেহারা দেখা যায় না!

কুমার বললে, এটা কি জীব বিনয়বাবু? এর ডানা আছে বটে, কিন্তু দেহের আর কোনও জায়গাই পাখির মতো নয়! এর চঞ্চুতে কত বড় বড় দাঁত দেখুন। দেহটা গিরগিটির মতো, যার গায়ের কোথাও পালকের চিহ্নমাত্র নেই।

বিমল বললে, আকারেও এ জীবগুলো প্রায় মানুষের মতোই বড় আর ডানা দুখানা প্রায় পনেরো হাত লম্বা। সিন্দাদের গল্পে রকপাখির কথা পড়েছি, সে-ও মানুষকে ছোঁ মেরে নিয়ে যেতে পারত। এটা রকপাখি নয় তো?

আমি বললুম, না। আসলে এটা পাখিই নয়। এদের উপরে দুখানা হাত আর নীচে দুখানা পা আছে। প্রত্যেক হাতে চারটি করে আঙুল। চতুর্থ আঙুলটা লম্বা হয়ে গেছে, আর তাতেই জালের মতো ডানাখানা ঝুলছে। পাখির ডানার গড়ন এরকম হয় না!

কুমার বললে, পাখি নয় তো এটা কি?

আমি বললুম, উড়ন্ত সরীসৃপ! এ-ও একরকম সেকেলে জীব। পণ্ডিতেরা এর নাম দিয়েছেন Pterodactyl। কিন্তু আমরা একে গরুড় পাখি বলেই ডাকব।

সেইদিন সন্ধেবেলাতেই কুমারের কম্প দিয়ে জ্বর এল। গরুড় পাখির দাঁতে নিশ্চয়ই কোনওরকম বিষ আছে। তার হাতখানাও বিষম ফুলে উঠল। একে এই অজানা দেশ, তাই সঙ্গে কোনও ঔষধ নেই, কাজেই কুমারের জন্যে প্রথমটা আমাদের মনে বড় ভাবনা হল।

যা হোক, প্রায় দিন পনেরো ভুগে কুমার সে যাত্রা প্রাণে-প্রাণে বেঁচে গেল, আমরাও আস্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম।

.

ডাইনসরের পাল

গুহার বাইরে একখানা পাথরের উপরে আমি আর বিমল চুপ করে বসেছিলুম।

সন্ধ্যা হয় হয়। পশ্চিমের মেঘে মেঘে থরে থরে আবির সাজিয়ে সূর্যদেব আজকের মতো ছুটি নিয়েছেন এবং সেই রঙিন মেঘগুলির ছায়া সমুদ্রের নীলপটের উপরে দেখাচ্ছিল যেন ঠিক জলছবির মতো।

চারিদিকের স্তব্ধতার ভিতরে আমার মন আজ কেমন কেমন করতে লাগল। কোথায় আমাদের শ্যামলা বাংলাদেশ, আর কোথায় আমরা পড়ে আছি। এমন শান্ত সন্ধ্যার সময়ে বাংলাদেশের পল্লিতে-পল্লিতে কত শঙ্খের সাড়া জেগে উঠেছে, বধূরা তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করছে, ছেলের দল ঠাকুরঘরে ভিড় করে আরতির কঁসর বাজাবার জন্যে পরস্পরের সঙ্গে কাড়াকাড়ি লাগিয়ে দিয়েছে!

এমন সময়ে বিমল হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, বিনয়বাবু একটা কথা ভেবে দেখেছেন কি?

আমার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল। মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, কি বিমল?

কাছিমের ডিম আর মাংস দুই-ই ফুরিয়ে গেছে। এবার কি খেয়ে আমরা বাঁচব?

আবার কাছিম ধরতে হবে।

বিমল খানিকক্ষণ পূর্বদিকে তাকিয়ে রইল। সেখানকার নিবিড় অরণ্য তখনও অস্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছিল।

বিমল আঙুল দিয়ে সেই দিকটা দেখিয়ে বললে, তার চেয়ে ওই দিকে চলুন।

কেন?

ওখানে কোনও নতুন শিকার মেলে কিনা দেখা যাক। রোজ রোজ কাছিমের মাংস আর ভালো লাগে না। সেদিন পাহাড়ে উঠে দেখেছিলেন তো, ওই বনের পাশে মস্ত একটা হ্রদ আছে? ওই হ্রদের আশেপাশে নিশ্চয়ই নতুন কোনও শিকারের সন্ধান পাওয়া যাবে।

সঙ্গে সঙ্গে নতুন কোনও বিপদেরও সন্ধান মিলতে পারে!

বিনয়বাবু, বিপদ এ-দ্বীপের কোথায় নেই? কাছিম ধরতে গেলেও তো আবার সাগর দানবের সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। বিশেষ, এ-দ্বীপের কোথায় কি আছে না আছে, সেটা আমাদের জেনে নেওয়া দরকার। নইলে এখানে আমাদের বেঁচে থাকা সহজ হবে না!

বিমলের কথা যুক্তিসঙ্গত বটে! কাজেই আমি সায় দিয়ে বললুম, আচ্ছা বিমল, তোমার প্রস্তাবে আমি রাজি!

পরদিন সূর্য ওঠবার আগেই আমি, বিমল আর রামহরি গুহার ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়লুম। কুমার তখনও ভালো করে সেরে ওঠেনি বলে তাকে কমলের তত্ত্বাবধানে গুহাতেই রেখে গেলুম। বাঘা আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই চলল। কুমারের বন্দুকটা নিলুম আমি।

সমুদ্রের জলে স্নান করে ভোরের ঠান্ডা হাওয়া সেই নিস্তব্ধ মাঠের ভিতর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল, সে হাওয়া আমার বড়ই মিষ্টি লাগল। খানিক পরেই সুদূরের সবুজ বনের মাথায় স্বর্গীয় মুকুটের মতো সূর্যের মুখ জেগে উঠল।

রামহরি বললে, খোকাবাবু, তুমি কি আবার ওই মায়নামতীর মায়াকাননে যেতে চাও?

বিমল হেসে বললে, যদি যাই, তাহলে কি হবে রামহরি?

রামহরি মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, এবারে ওখানে গেলে তুমি আর প্রাণে বাঁচবে না।

কেন রামহরি, তুমি থাকতে আমাকে প্রাণে মারে কে?

আমি বেঁচে থাকলে তবে তো তোমাকে বাঁচাব? ও বনে ঢুকলে আমরা কেউ আর জ্যান্ত ফিরব না।

ভয় নেই রামহরি আজ আমরা বনের ভেতরে আর ঢুকব না। বনের পাশে একটা হ্রদ আছে, আমরা সেইখানেই যাচ্ছি।

এমনি নানা কথা কইতে খানিক দূর এগিয়ে যেতেই দেখলুম হ্রদের জল সূর্যের কিরণে ইস্পাতের মতো চকচক করে উঠছে!

আর কিছু দূর অগ্রসর হয়েই বুঝলুম, সেই হ্রদের আকার কি বিপুল! তার এপার থেকে ওপারের বিস্তার অন্তত কয়েক মাইলের কম হবে না। তার জলের ভিতরে মাঝে মাঝে

কতকগুলো ছোট-বড় পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে এবং সেই পাহাড়গুলোর উপরে সাদা সাদা পাখির মতো কি যেন ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে আর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে।

তারপর আমরা যখন একেবারে হ্রদের ধারে গিয়ে পড়লুম তখন দেখা গেল, সেগুলো হাঁস ছাড়া আর কিছুই নয়!

বিমল আশ্চর্য হয়ে বললে, কিন্তু এ কি রকম হাঁস? এদের একটারও যে ডানা নেই।

আমি বললুম, বিমল, এ-দ্বীপের কোনও জীব দেখেই তুমি আর আশ্চর্য হোয়ো না! কারণ তোমাকে আগেই বলেছি যে এ হচ্ছে সেকেলে জীবের রাজ্য।

সেকেলে হাঁসের কি ডানা ছিল না?

না। দরকার হয়নি বলে সেকেলে হাঁসের ডানা গজায়নি। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মই হচ্ছে এই, দরকার না থাকলে কোনও কিছুই সৃষ্টি হয় না। বিশেষ, প্রকৃতির পরীক্ষা কার্য তখনও ভালো করে জমে উঠেনি, কোনও জীবের কি আবশ্যক আর কি অনাবশ্যক প্রকৃতি তাও তখনও তা নিশ্চিতরূপে বুঝতে পারেনি, তাই সেকেলে জীবজন্তুদের দেহে অনেক বাহুল্য, আবার অনেক অভাব আর অপূর্ণতাও থেকে গিয়েছিল। এই, মানুষের কথা ধরো না কেন। সেকেলে মানুষদের মস্তিষ্ক, চোখ, মুখ, নাক, দাঁত, ঘাড়, বুক, হাত, পা-কিছুই একেলে মানুষদের মতো ছিল না, সেকালে-

হঠাৎ আমার কথায় বাধা দিয়ে বাঘার গর্জনের সঙ্গে রামহরি চেঁচিয়ে উঠল-ও কি

ফিরে দেখি, খানিক তফাতে মহিষের চেয়েও উঁচু একটা জীব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের লক্ষ করছে।

আমি বলে উঠলুম-এন্টেলোডন্ট, এন্টেলোডন্ট!

বিমল বললে, এন্টেলোড়ন্ট! সে আবার কি?

সেকেলে দানব-শূকর!

বিমল তখনই বন্দুক ছুড়লে এবং পর মুহূর্তেই শূকরটা মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ল।

আমরা সবাই তার দিকে দৌড়ে গেলুম। কিন্তু শূকরটা মরেনি, আহত হয়েছিল মাত্র। কারণ আমরা তার কাছে যাওয়ার আগেই সে আবার দাঁড়িয়ে উঠে তাড়াতাড়ি সামনের জঙ্গলের দিকে ছুটল।

সব আগে বাঘা, তারপর বিমল, তারপর আমি আর রামহরি-এইভাবে আমরা শুকরটার পিছনে ছুটতে লাগলুম। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই শূকরটা বনের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রামহরি চেঁচিয়ে বললে, বনের ভেতরে ঢুকো না খোকাবাবু, বনের ভেতরে ঢুকো না।

কিন্তু বিমলের মাথায় তখন শিকারির গোঁ চেপেছে স্যিদিব্য জ্ঞান হারিয়ে সেই নিবিড় অরণ্যের মধ্যে সে প্রবেশ করলে। কাজেই তার পিছনে যাওয়া ছাড়া আমাদেরও আর উপায়ান্তর রইল না।

বন যখন ক্রমে অত্যন্ত ঘন হয়ে উঠল, তখন আমিও বলতে বাধ্য হলুম, বিমল আর নয়, এইবারে আমাদের ফেরা উচিত।

বিমল বললে, এই যে শুয়োরের রক্তের দাগ এখনও দেখা যাচ্ছে।

এমনি করে ঘণ্টা দুয়েক ছুটাছুটির পর রক্তের দাগও আর পাওয়া গেল না। বিমল হতাশ ভাবে একটা গাছের তলায় বসে পড়ল। আমরাও বিষম হাঁপিয়ে পড়েছিলুম, সেখানেই এক-একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বিশ্রাম করতে লাগলুম।

প্রায় আধ ঘণ্টা বিশ্রামের পর আমি দাঁড়িয়ে উঠে বললুম, চলো, এইবারে ফেরা যাক।

বিমল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, কাজেই।

খানিকদূর অগ্রসর হয়ে বুঝলুম, আমরা ভুল পথ ধরে চলেছি। সেদিকে থেকে ফিরে এসে আবার অন্য পথ ধরলুম, কিন্তু তবু বন থেকে বেরুবার পথ খুঁজে পেলুম না।

তখন বেলা দুপুর হবে। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখানে উপরে নীচে, চারপাশে এমন বিষম জঙ্গল আর গাছপালা যে, দুপুরের সূর্যালোকও সে বনের ভিতরে ঢুকতে সাহস করেনি!

আমি দমে গিয়ে বললুম, বিমল আমরা পথ হারিয়েছি।

বিমল বললে, পথ আমাদের খুঁজে বার করতেই হবে। এইদিকে আসুন।

বিমলের পিছনে পিছনে আবার চললুম। কিন্তু মিনিট কয়েক পরেই হঠাৎ চমকে বিমল থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

আমি শুধোলুম, কী হল বিমল, হঠাৎ দাঁড়ালে কেন?

কোনও জবাব না দিয়ে, বিমল শুধু হাত তুলে ইশারায় বললে, চুপ।

আমি পা টিপে এগিয়ে গিয়ে যা দেখলুম, তাতে আমার পাদুটো যেন অসাড় হয়ে মাটির ভিতরে বসে গেল! তেমন অভাবিত দৃশ্য জীবনে আর কখনও আমি দেখিনি!

পথের পাশেই জঙ্গলের ভিতর থেকে খানিকটা ভোলা জমি দেখা যাচ্ছে, সেই জমির ভিতরে দলে দলে ভীষণ দর্শন জীব বিচরণ করছে তাদের অধিকাংশই মাথায় প্রায় ষাট সত্তর ফুট–অর্থাৎ তালগাছের সমান উঁচু।

সেদিন যে কুমির কাঙারু আমাদের তাড়া করেছিল, এ জানোয়ারগুলোকে দেখতে প্রায় তারই মতো; তফাত খালি এই যে, এগুলো লম্বা চওড়ায় তার চেয়েও প্রায় দুগুন বড়।

আমি তাড়াতাড়ি গুণে দেখলুম, দলের ভিতরে প্রায় নব্বইটা জানোয়ার রয়েছে। কোন কোনটা ল্যাজ ও পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে, মস্ত উঁচু গাছের আগডাল সামনের

দুই পা বা হাত দিয়ে ভেঙে নিয়ে চর্বণ করছে। কোনও কোনওটা কাঙারুর মতো লাফিয়ে এদিকে ওদিকে যাচ্ছে আসছে। আবার কোন কোনওটা চুপ করে বসে আছে। কতকগুলো অপেক্ষাকৃত ছোট জীব পরস্পরের সঙ্গে খেলা করছে নিশ্চয়ই সেগুলো বাচ্চা। কিন্তু বাচ্চা হলেও মাথায় তারা প্রায় হাতির মতো উঁচু।

আমি চুপিচুপি বললুম, বিমল, এগুলো ডাইনসর।

বিমল বললে, বন থেকে বেরুতে গেলে এদের সমুখ দিয়ে যেতে হয়, এখন উপায়

যতক্ষণ না এরা বিদায় হয়, ততক্ষণ আমাদের বনের ভেতরেই বসে থাকতে হবে। তা ছাড়া আর কোনও উপায় তো দেখি না।

বাঘা এতক্ষণ ভয়ে বোবা হয়ে পেটের তলায় ল্যাজ গুটিয়ে জীবগুলোকে দেখছিল– হঠাৎ বনের ভিতর দিকে ফিরে গোঁ গোঁ করে উঠল। আমরাও পিছন ফিরে দেখলুম বনের অন্ধকারের ভিতর থেকে বড় বড় গাছ দুলিয়ে আর একটা প্রকাণ্ড কি জানোয়ার আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে।

রামহরি মড়ার মতো ফ্যাকাশে মুখে বললে, খোকাবাবু, এবার আর আমাদের রক্ষা নেই।

সত্য কথা বনের ভিতরে আর বাইরে দু-দিকেই সাক্ষাৎ মৃত্যু আমাদের চোখের সামনে বিরাজ করছে, পালাবার কোনও পথই আর ভোলা নেই। এবারে বন্দুকের সাহায্যেও আত্মরক্ষা। করতে পারব না, কারণ বন্দুকের শব্দে সমস্ত জীবগুলোই খেপে গিয়ে একসঙ্গে আমাদের আক্রমণ করতে পারে।

হতাশ হয়ে মরণের অপেক্ষায় আমরা তিনজনে দাঁড়িয়ে রইলুম পাথরের মূর্তির মতো।

.

অরণ্যের বিভীষিকা

বনের ভিতর থেকে যে শব্দটা আসছিল, হঠাৎ তা থেমে গেল। তারপর খানিকক্ষণ আর কোনও সাড়া নেই।

আমরা তখনও তেমনি আড়ষ্ট হয়েই দাঁড়িয়ে রইলুম প্রাণের আশা ছেড়ে দিয়ে।

রামহরি হঠাৎ আমার গা টিপলে। তার দিকে ফিরতেই সে বনের উপর পানে অঙ্গুলি নির্দেশ করলে।

মাথা তুলে যা দেখলুম, তাতে আমার দেহের রক্ত যেন জল হয়ে গেল।

আমাদের কাছ থেকে মাত্র হাত-পনেরো তফাতেই বনের ফাঁকে একখানা ভয়ঙ্কর বিশ্রী এবং প্রকাণ্ড মুখ জেগে আছে।

আমরা তিনজনেই আস্তে আস্তে সেইখানে গুঁড়ি মেরে বসে পড়লুম।

বিমল চুপিচুপি বললে, আবার সেই কুমির কাঙারু।

রামহরি বললে, কিন্তু ও আমাদের দিকে তো তাকিয়ে নেই।

হ্যাঁ, সে তাকিয়ে আছে বনের বাইরের দিকে।

বিমল বললে, ডাইনসরের দিকে চেয়ে আছে আমাদের দেখতে পায়নি।

ডাইনসরগুলো তখনও নিশ্চিন্ত মনে মাঠের ভিতরে বিচরণ করছিল।

সেই ভীষণ মুখখানা আবার গাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু তারপরেই দেখলুম, তার বিরাট দেহ গুঁড়ি মেরে জঙ্গলের ভিতর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছে।

কী যে তার অভিপ্রায় কিছুই বুঝতে না পেরে মনে-মনে আমরা ভগবানকে ডাকতে লাগলুম।

কিন্তু একটু পরেই তার অভিপ্রায় বেশ বোঝা গেল। সে তেমনি সন্তর্পণে বুকে হেঁটে বন থেকে বেরিয়ে মাঠের ভিতর গিয়ে পড়ল, তারপর ডাইনসরের দলের দিকে আস্তে আস্তে অগ্রসর হতে লাগল।

আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললুম, বিমল, এখনই আমরা সেকেলে বিয়োগান্ত নাটকের একটা আধুনিক অভিনয় দেখতে পাব। এই কুমির কাঙারু যাচ্ছে ওই ডাইনসরদের আক্রমণ। করতে!

বিমল আশ্চর্য স্বরে বললে, ডাইনসরদের আক্রমণ করতে! কিন্তু কুমির কাঙারু পারবে কেন? একে ডাইনসররা আকারে ওর চেয়ে দু-গুন বড়, তার ওপরে গুণতিতেও তারা নব্বইটার কম নয়!

আমি বললুম, বাঘের চেয়ে ঘোড়া বা জিরাফ তো ঢের বড় কিন্তু ঘোড়া বা জিরাফের দলে যদি বাঘ পড়ে, তাহলে তাদের কি অবস্থা হয় জানো তো? কুমির-কাঙারু মাংসাশী আর হিংস্র, নিরামিষভক্ত ডাইনসরের চেয়ে আকারে ছোট হলেও তার গায়ের জোরও ঢের বেশি।

রামহরি উৎসাহিত কণ্ঠে বললে, দেখুন, দেখুন!

চেয়ে দেখলুম কুমির কাঙারুটা তখন ডাইনসরদের খুব কাছে গিয়ে পড়েছে। হঠাৎ ডাইনসররাও তাকে দেখতে পেলে এবং পর মুহূর্তেই আর্তনাদে সারা বন কাঁপয়ে লাফাতে লাফাতে বেগে পিছতে লাগল। কুমির কাঙারুও ভীষণ এক গর্জন করে তাদের পশ্চাৎ অনুসরণ করলে এবং দেখতে-দেখতে একটা ডাইনসরকে ধরে ফেললে।

তারপর যে ভয়াবহ দৃশ্যের অভিনয় হল তা আর বর্ণনীয় নয়। মানুষের চোখ এমন দৃশ্য বোধহয় আর কখনও দেখেনি। ডাইনসরটা যদিও আকারে অনেক বড় তবু কুমির কাঙারুটা মস্ত এক লাফ মেরে বিষম বিক্রমে তার গলার তলাটা কামড়ে ধরে তাকে মাটির উপরে পেড়ে ফেললে। তাদের গর্জনে ও আর্তনাদে আমাদের কান যেন কালা হয়ে

গেল, লাঙ্গুল আস্ফালনে এবং লাফালাফির চোটে চারদিকে রাশি রাশি ধুলো উড়তে লাগল ও পৃথিবীর বুক থরথর করে কাঁপতে লাগল,–এদিকে ওদিকে তিন-চারটে প্রকাণ্ড বৃক্ষ মাটির উপরে ভেঙে লুটিয়ে পড়ল। ঘণ্টাখানেক পরে সেই অদ্ভুত যুদ্ধ সমাপ্ত হল। তখন দেখা গেল, ডাইনসরের বিপুল দেহ মাঠের উপরে স্থির হয়ে পড়ে আছে এবং কুমির-কাঙারু পিছনের দুই পা ও ল্যাজের উপর ভর দিয়ে বসে হাঁ করে হাঁপাচ্ছে এবং তার মুখের দুই পাশ ও দেহ দিয়ে হু-হু করে রক্তের স্রোত ছুটছে। খানিক বিশ্রামের পর মাটির উপরে ল্যাজ আছড়াতে-আছড়াতে সে আকাশপানে মুখ তুলে কয়েকবার গগনভেদী জয়নাদ করলে, তারপর মৃত ডাইনসরের দেহটা ভক্ষণ করতে প্রবৃত্ত হল। সে এক বীভৎস দৃশ্য এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের ভীত চক্ষের সামনে সেই দৃশ্যের অভিনয় চলল!

সন্ধ্যার অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে গেল, আমরা কিন্তু তখনও বাইরে পা বাড়াতে সাহস করলুম না।

বিমল উদ্বিগ্ন স্বরে বললে, কী হবে বিনয়বাবু। খাবারের খোঁজে এসে এদিকে অনাহরে প্রাণ যে যায়!

আমি মনের দুশ্চিন্তা গোপন করে বললুম, কোনওই উপায় নেই! আজকের রাত এই বনের ভেতরে আমাদের কাটাতে হবে। এখন বন থেকে বেরুলেই মৃত্যু!

রামহরি বললে, কিন্তু কালও হয় তো আমরা পথ খুঁজে পাব না।

আমি বললুম, আমরা এসেছি পূর্বদিকে। কাল সূর্য উঠলে পর আমরা পশ্চিম দিকে অগ্রসর হব। তা হলে আমরা যে পথে এসেছি সে পথ না পেলেও খুব সম্ভব হ্রদের ধারে গিয়ে পড়তে পারব।

বনের ভিতরে রাত ঘনিয়ে এল, সঙ্গে সঙ্গে নানারকম বিভীষিকার সূত্রপাত হল! এতক্ষণ যে বিশাল অরণ্যে কেবল পত্রমর্মর ছাড়া আর কোনও শব্দই শোনা যাচ্ছিল না, এখন তার

চারিদিকেই নানারকম অদ্ভুত আওয়াজ শোনা যেতে লাগল! নিবিড় অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছে না; শোনা যাচ্ছে খালি শব্দ! গাছের উপরে শব্দ, জঙ্গলের ভিতরে শব্দ, আমাদের আশেপাশে শব্দ! কোনও শব্দ গাছের উপরে ওঠানামা করছে, কোনও শব্দ চারিদিকে আনাগোনা করছে, কোনও শব্দ যেন এক জায়গাতেই স্থির করে দাঁড়িয়ে আছে। বেশ বুঝতে পারলুম আমাদের খুব কাছ দিয়েই অনেকগুলো অতিকায় জীব আসা যাওয়া করছে, কারণ তাদের পায়ের চাপে পৃথিবীর মাটি থেকে থেকে কেঁপে উঠছে! সেইসব জীবের আকার যে কত ভয়ানক, তা ভগবানই জানেন! আমরা তিনজনে আতঙ্কে ও ক্ষুধাতৃষ্ণায় প্রায় মরমর হয়ে চুপ করে সেইখানেই বসে রইলুম জড় পাষাণের মতো!

হঠাৎ রামহরি চেঁচিয়ে উঠল এবং পরমুহূর্তেই কে এক ধাক্কা মেরে আমাকে মাটির উপরে ফেলে দিলে এবং আমি উঠে বসবার আগেই একটা প্রকাণ্ড ভারী দেহ আমার বুকের উপর চেপে বসল! কে যে আমাকে এমন অতর্কিতে আক্রমণ করলে, অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেলুম না, কিন্তু তার দেহের চাপে আমার দেহের হাড়গুলো যেন ভেঙে যাওয়ার মতো হল। সৌভাগ্যক্রমে বন্দুকটা তখন আমার হাতেই ছিল, কোনওরকমে বন্দুকের নলটা আক্রমণকারীর দেহে লাগিয়ে এক হাতেই আমি ঘোড়া টিপে দিলুম, সঙ্গে সঙ্গে বিকট এক আর্তনাদ করে সে জীবটা আমাকে ছেড়ে দিয়ে মাটির উপরে পড়ে গেল এবং তারপরেই পায়ের শব্দ শুনে বুঝলুম, সে বেগে পলায়ন করছে!

হঠাৎ রামহরি আর্তনাদ করে উঠল।

বিমল বললে, কী হল, কী হল রামহরি?

রামহরি বললে, কে আমার পা মাড়িয়ে দিয়ে গেল।

আমি উঠে বসে বললুম, কি একটা জানোয়ার আমার বুকের উপরে চেপে বসেছিল, কিন্তু আমার বন্দুকের গুলি খেয়ে সে পালিয়ে গেছে।

বিমল বললে, কিন্তু এখনই যে বিরাট আর্তনাদ শুনলুম সে তো জানোয়ারের চিৎকার নয় সে যে মানুষের চিৎকার!

আমি বললুম, আমারও তাই মনে হল। কিন্তু বন্দুকের বিদ্যুতের মতো আলোতে আমি এক পলকের জন্যে যে জুলন্ত চোখ আর যে ধারাল দাঁতগুলো দেখতে পেয়েছি, তা তো মানুষের নয়! তার গায়ে যে জানোয়ারের মতো বড় বড় লোম ছিল তাও আমি জানতে পেরেছি, কিন্তু আর কিছু জানবার সময় আমি পাইনি–সে জীবটা এসেছে আর পালিয়েছে দুই সেকেন্ডের মধ্যেই।

সেই মুহূর্তের অরণ্যের অন্ধকার ভেদ করে আবার এক তীব্র আর্তস্বর জেগে উঠল। ঠিক যেন কোনও মানুষ মর্মভেদী যাতনায় চিৎকার–স্বরে ক্রন্দন করছে।

.

অরণ্যের গর্ভে

সেই আর্তনাদ! কিছুতেই আমরা তা ভুলতে পারলুম না, তার প্রতিধ্বনি যেন আরও ভীষণ হয়ে আমাদের বুকের ভিতর ঘুরে বেড়াতে লাগল।

এই সেকেলে জীবের রাজ্যে, অমন মানুষের মতো স্বরে কেঁদে উঠল কে? আমি এখানে একলা থাকলে ভাবতুম, এ আমার কানের ভ্রম। কিন্তু আমাদের তিন জনেরই তো শোনবার ভুল হতে পারে না। অথচ এ বনে মানুষ থাকা সম্ভব নয়, কারণ এই দ্বীপের কোথাও আজ পর্যন্ত আমরা মানুষের চিহ্নমাত্র দেখতে পাইনি।

অন্ধকারে অবাক হয়ে বসে বসে আমি ভাবতে লাগলুমআর ওদিকে বনের মধ্যে তেমনি নানা রকম অদ্ভুত শব্দ ক্রমাগত শোনা যেতে লাগল। ভয়ে আমরা কেউ আর কারুর সঙ্গে কথা পর্যন্ত কইতে সাহস করলুম না কি জানি, আবার যদি কোনও ভয়ানক জীব শুনতে পেয়ে আমাদের আক্রমণ করতে আসে!

বনের ভিতরে সেই সব অজানা শব্দ শুনে আমার মনে হতে লাগল যে, অন্ধকারে যেন আমাদের বিরুদ্ধে কারা ষড়যন্ত্র করছে। ধুপ-ধুপ, দুম-দুম, খসখস, মড়মড়, সোঁ-সো, সর-সর। শব্দগুলো যেন চারিদিক থেকে ক্রমাগত বলছে–আমরা তোমাদের হত্যা করব, আমরা তোমাদের হত্যা করব, আমরা তোমাদের হত্যা করব! নিবিড় অন্ধকারে দেহ ঢেকে চারিদিকে কারা যেন ওৎ পেতে বসে আছে, তাদের রক্তলোলুপ জ্বলন্ত দৃষ্টি আমরা যেন সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করতে লাগলুম। মাঝে-মাঝে কাদের আনাগোনার পায়ের শব্দ শুনি আর মনে হয়। ওই ওরা এসে পড়ল–ওই ওরা এসে পড়ল।...ওঃ, রাত যেন আর পোয়াতেই চায় না।

আমরা যেন চির-অন্ধকারের কারাগারের মধ্যে আজীবনের জন্যে বন্দি হয়ে আছি আর চারিদিক থেকে শুধু সেই একই শব্দ শোনা যাচ্ছে–আমরা তোমাদের হত্যা করব, আমরা তোমাদের হত্যা করব, আমরা তোমাদের হত্যা করব।

আর একটা মারাত্মক বিপদ থেকে কোনও গতিকে বেঁচে গেলুম।...হঠাৎ কার মাটি কাঁপানো পায়ের শব্দ শুনলুম, তারপরেই মনে হল, এক জায়গায় অন্ধকার যেন আরও ঘন হয়ে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। সেই জ্বলন্ত ঘনীভূত অন্ধকারের মধ্যে ঠিক বাতাবি লেবুর মতো বড় দুটো আগুনের ভঁটা জ্বলজ্বল করে জ্বলছে–মাটি থেকে অনেক অনেক উঁচুতে। নিশ্চয় সে দুটো কোনও অতিকায় জীবের চোখ। জীবটা যে কোন জাতের তা বোঝা গেল না বটে, তবে তার নিশ্বাসের হু-হু শব্দ আমরা স্পষ্ট শুনতে পেলুম। তার পরেই মড়মড় করে গাছ ভাঙার শব্দ হল এবং সঙ্গে-সঙ্গে সেই আগুনের আঁটা দুটো ও জুলন্ত অন্ধকারটা গভীরতর অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। রোমাঞ্চিত দেহে একেবারে মাটির সঙ্গে গা। মিশিয়ে মড়ার মতো স্তব্ধ হয়ে আমরা শুয়ে রইলুম। আর চারিদিক থেকে যেন সেই একই শাসানি শুনতে লাগলুম-হত্যা, হত্যা আমরা তোমাদের হত্যা করব।...

দুশ্চিন্তা ও আতঙ্কে আমরা যখন পাগলের মতো হয়ে উঠেছি, পূর্ব-আকাশ তখন উষার ভোরের প্রদীপ ধীরে-ধীরে জ্বলে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে অরণ্যের মধ্যে অন্ধকারের জীবদের আনাগোনার শব্দ আশ্চর্যরূপে থেমে গেল। আমরাও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে উঠে বসলুম।

বিমল বললে, কাল যে জীবটা আমাদের আক্রমণ করতে এসেছিল, এই দেখুন তার রক্তের দাগ। এতক্ষণে নিশ্চয় সে মরে গেছে। আসুন বিনয়বাবু, এইবারে দেখা যাক, সেটা কি জীব।

আমি আপত্তি করে বললুম, না, না, ক্ষুধাতৃষ্ণা আর পরিশ্রমে আমরা মরমর হয়ে পড়েছি, এখন কেবল বন থেকে বেরুবার চেষ্টা করা ছাড়া আর কোনওদিকেই যাওয়া উচিত নয়- কি জানি, আবার যদি কোনও নতুন বিপদে পড়ি!

বিমল আমার আপত্তি শুনলে না, সে মাটির উপর শুকনো রক্তের দাগ ধরে অগ্রসর হয়ে বললে, না বিনয়বাবু, মানুষের মতো কাঁদে কোন জীব, সেটা দেখতেই হবে। সে তো আর বেঁচে নেই, তবে আর কীসের ভয়!

বিমলের কথা শেষ হতে না হতেই বনের ভিতরে ভয়ানক এক গর্জন শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে বিমলও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

রামহরি বললে, এ যে বাঘের ডাক!

আবার সেই গর্জন-এবারে আরও কাছে! তার পরেই ভারী ভারী পায়ের শব্দ- যেন মস্তবড় একটা জীব দৌড়ে আসছে।

আমি চেঁচিয়ে উঠলুম, সাবধান, বিমল সাবধান।

হাতির মতো প্রকাণ্ড একটা জানোয়ার বনের ভিতর থেকে তিরবেগে বেরিয়ে এল, তারপরেই চোখের নিমেষে পাশের জঙ্গলের মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গেল! জীবটা হাতির মতো বড় বটে, কিন্তু দেখতে ঠিক ষাঁড়ের মত।

বিমল আর রামহরির মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন দেখে আমি বললুম, ও হচ্ছে সেকালের ষাঁড়।

বিমল বিস্ফারিত চোখে বললে, হাতির মতো বড়!

হ্যাঁ। হাজার দুই বছর আগেও রোমানরা ওইরকম ষাঁড় জার্মান দেশে দেখেছিল।

রামহরি বললে, কিন্তু ওই ষাঁড় কি বাঘের মতো ডাকে!

না, বাঘের ডাক শুনেই ষাঁড়টা পালিয়ে গেল। এ বনে সেকেলে বাঘ আছে। সেকেলে বাঘের গায়ে এখনকার বাঘের মতো দাগ নেই, আকারেও তারা অনেক বড়, আর তাদের মুখের উপর-চোয়ালে ছোরার মতো লম্বা দুটো দাঁত আছে। বিমল, এ বাঘের বিক্রম কীরকম বুঝছে তো! এতবড় একটা ষাঁড় তার ভয়ে প্রাণপণে পালিয়ে গেল, আমাদের এখনই এ বন ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত।

বিমল বললে, আপনার কথাই ঠিক! কালকে আমাদের কে আক্রমণ করেছিল, তা আর দেখবার দরকার নেই, এ সর্বনেশে বন থেকে এখন প্রাণ নিয়ে বেরুতে পারলে বাঁচি!

পূর্বদিকে বনের মাথায় সূর্যকে দেখা গেল, প্রদীপ্ত কাঁচা সোনার অপূর্ব মুকুটের মতো! কিন্তু এখানে বনের পাখি তার আবাহন-গান গাইলে না। সূর্য শুধু নিরানন্দ নীরবতার মাঝে পৃথিবীর বুকে সোনার হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

আমরা এসেছি পশ্চিম দিক থেকে, তাই সেই দিকেই যাত্রা শুরু করে দিলুম।

.

নতুন বিপদের সূচনা

ক্ষুধার জন্যে যত না হোক, তৃষ্ণার তাড়নায় চলতে-চলতে আমাদের প্রাণ হয়ে উঠল ওষ্ঠাগত। জলের অভাব যে কি ভয়ানক অভাব, জীবনে আজ প্রথম তা কল্পনা করতে

পারলুম। চলতে চলতে প্রতি পদই মনে হতে লাগল, এই বুঝি দম বন্ধ হয়ে যায়, এই বুঝি মাথা ঘুরে মাটিতে পড়ে গেলুম। মাথার মধ্যে যেন আগুনের আংরা জ্বলছে, মুখের ভিতর থেকে জিভটা বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে, আর মন চাইছে পথ চলা বন্ধ করে সেইখানেই শুয়ে জীবনের সব লীলা সাঙ্গ করতে।

সেই ভোর থেকে হাঁটছি আর হাঁটছি সূর্য এখন মাঝ আকাশে, তবু এই অভিশপ্ত অরণ্য যেন আর আমাদের মুক্তি দিতে চায় না। এ অরণ্য যেন অনন্ত–এ অরণ্য যেন এক রাত্রের মধ্যে সারা পৃথিবীকে গ্রাস করে ফেলেছে।

রামহরি ঠিক মাতালের মতো টলতে টলতে চলেছে, তার চোখ দুটো ঠিক পাগলের মতো হয়ে উঠেছে, আমারও প্রায় সেই অবস্থা কিন্তু ধন্য বটে বিমল ছেলেটি, সে-ও যে ভিতরে ভিতরে আমাদেরই মতো কষ্ট পাচ্ছে তাতে আর কোনওই সন্দেহ নেই, কিন্তু তার মুখে-চোখে বা ভাবভঙ্গিতে সেকষ্টের কোনও লক্ষণই ফুটে ওঠেনি, ধীর প্রশান্তভাবে হাসিমুখে সে আমাদের আগে-আগে অগ্রসর হচ্ছে।

শেষটা রামহরি একেবারে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে পড়ল।

বিমল বললে, ও কী রামহরি বসলে কেন?

রামহরি কাতর ভাবে বললে, খোকাবাবু, জল না খেলে আমি আর চলতে পারব না।

আর একটু পরেই জল পাব, ওঠো রামহরি, ওঠো!

না খোকাবাবু, না রাজ্যের সব জল শুকিয়ে গেছে, জল আর পাব না। জল না পাই, আমাকে শান্তিতে মরতে দাও। তোমরা চলে যাও, আমার জন্যে ভেব না।

বিমল আর কিছু বললে না, হেঁট হয়ে রামহরিকে ঠিক শিশুর মতো নিজের কাঁধের উপরে তুলে নিয়ে অনায়াসেই আবার হাঁটতে শুরু করলে। আমি তো দেখেশুনে অবাক। বলবান বলে আমার নিজের যথেষ্ট খ্যাতি আছে, কিন্তু আজ দু-দিনের অনাহার, পথশ্রম ও তৃষ্ণার

তাড়না সহ্য করবার পর রামহরির মতো একজন বৃহৎ লোককে ঘাড়ে করে পথ চলার শক্তি যে কতখানি বল ও বিক্রম ও কষ্টসহিষ্ণুতার কাজ, তা বুঝতে পেরে মনে মনে বিমলকে আমি বারবার ধন্যবাদ দিতে লাগলুম।

তারপর যখন নিরাশার চরম সীমায় গিয়ে দাঁড়িয়েছি এবং প্রাণের আশা ছেড়ে আমিও রামহরির মতো শুয়ে পড়ব বলে মনে করছি তখন আচম্বিতে বনের ফাঁকে জেগে উঠল, ও কী কল্পনাতীত দৃশ্য!

চোখের সামনে স্পষ্ট দেখলুম, বিশাল হ্রদের নীল জল অদূরেই টলটল ঢলঢল করছে– সূর্যকিরণে বিদ্যুতের মতো চমকে-চমকে উঠছে।

কিন্তু এ চোখের ভ্রম নয় তো? সত্যিই কি বন শেষ হয়েছে, আমরা আবার হ্রদের তীরে এসে পড়েছি?

বিমলের হাত ছাড়িয়ে রামহরি মাটির উপর লাফিয়ে পড়ল, তারপর পাগলের মতো চাঁচাতে চাঁচাতে হ্রদের দিকে দৌড় দিলে, আমিও তার পিছনে-পিছনে ছুটতে লাগলুম– তারই মতো আনন্দে উদভ্রান্ত হয়ে।...আমরা তিনজন মিলে যতক্ষণ পারলুম প্রাণ ভরে জল পান করলুম। আহা, সে যে কি তৃপ্তি, কি আনন্দ, কেমন করে তা বর্ণনা করব? শেষটা পেটে যখন আর ধরল না, তখন আমরা বাধ্য হয়ে ক্ষান্ত হলুম।

রামহরি আহ্লাদে নাচতে নাচতে বললে, আঃ, আর আমার কোনও কষ্ট নেই, এখন আবার আমি একশো ক্রোশ হাঁটতে পারি।

আমারও সমস্ত শক্তি আবার ফিরে পেলুম।

বিমল ইতিমধ্যে গোটাকয়েক সেকেলে ডানাহীন হাঁস শিকার করে ফেললে, আমরা সাঁতার দিয়ে তাদের দেহগুলো জল থেকে ডাঙায় এনে তুললুম।

রামহরি মুখ চোকলাতে চোকলাতে বললে, খোকাবাবু, আমার আর দেরি সইবে না, চলো, চলো, তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে রান্না শুরু করে দি।

আমি বললুম, হ্যাঁ বিমল, আমাদের আর দেরি করা উচিত নয়, কুমার আর কমল এতক্ষণে আমাদের জন্যে ভেবে হয়তো আকুল হয়ে উঠেছে।

বিমল উঠে দাঁড়িয়ে বললে, হ্যাঁ, চলুন এইবার! আমরা তো বাসায় প্রায় এসে পড়েছি- ওই যে আমাদের পাহাড় দেখা যাচ্ছে!

সবাই আবার অগ্রসর হলুম। একবার জলপানের পরে আমাদের দেহে আবার নতুন শক্তির সঞ্চার হয়েছিল, তাই এবারে পথ চলতে কোনওই কষ্ট হল না। কিন্তু এ দ্বীপে বিপদ দেখছি পদে-পদে! আমরা যখন পাহাড়ের খুব কাছেই এসে পড়েছি মাথার উপরে তখন হঠাৎ শুনতে পেলুম এক বিশ্রী চিৎকার! উপরে চেয়ে দেখি দুটো হাড়কুৎসিত গরুড় পাখি চক্রাকারে ঘুরতে-ঘুরতে আমাদের দিকে নেমে আসছে!

তাদের উদ্দেশ্য যে ভালো নয়, তা বুঝতে আমাদের কিছুমাত্র বিলম্ব হল না। বিমলের বন্দুক তখনই গর্জন করে উঠল, সঙ্গে-সঙ্গে একটা পাখি গুলি খেয়ে মাটির উপর এসে পড়ল। পাখিটা সাংঘাতিকরূপে আহত হয়েছিল, কিন্তু সেই অবস্থাতেই করাতের মতো দাঁতওয়ালা চঞ্চু তুলে সে আমাদের আক্রমণ করতে এল। বিমল বন্দুকের কুঁদো দিয়ে প্রবল এক আঘাতে তার মাথাটা চূর্ণ করে দিলে। ততক্ষণে আমার বন্দুকের গুলিতে দ্বিতীয় পাখিটারও ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে গেল।

আমরা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই সৃষ্টিছাড়া জীব দুটোকে অবাক হয়ে দেখতে লাগলুম। বৈজ্ঞানিকরা যে কি দেখে এদের পাখি বলে স্থির করেছেন তা শুধু তারাই জানেন, কারণ পাখিদের সঙ্গে এই বীভৎস জীবগুলোর কিছুই মেলে না, তাদের দেহ পালকহীন ও সরীসৃপের মতো, দাঁতওয়ালা চঞ্চু আর পা হচ্ছে চারখানা ও লেজ হচ্ছে দড়ির মতো। কিম্ভুতকিমাকার!

এমন সময় বাঘার চিৎকার শুনলুম–ঘেউ, ঘেউ, ঘেউ। মুখ তুলে দেখলুম, চাঁচাতে চেঁচাতে সে আমাদের দিকেই বেগে ছুটে আসছে।

সত্যিই তো! বাঘা ছুটে আসছে বটে, কিন্তু খোঁড়াতে-খোঁড়াতে, পিছনের একখানা পা তুলে! তার চিৎকারেও আজ যেন কেমন কাতরতা মাখানো।

বাঘা ছুটে এসে একেবারে আমাদের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে হাঁপাতে লাগল।

বিমল হেঁট হয়ে পড়ে বিস্মিত কণ্ঠে বললে, বিনয়বাবু, বিনয়বাবু দেখুন! বাঘার গায়ে রক্ত।

হ্যাঁ, বাঘার সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত!

বিমল পাহাড়ের দিকে ছুটতে ছুটতে বললে, শিগগির আসুন, কুমার আর কমল বোধ হয় কোনও বিপদে পড়েছে।

আমি আর রামহরিও পাহাড়ের দিকে ছুট দিলুম।

পাহাড়ের উপরে উঠেও কোনও গোলমাল শুনতে পেলুম না। কিন্তু গুহার সামনে গিয়ে দেখলুম, সেখানে পাহাড়ের পাথর রক্তে একেবারে রাঙা হয়ে উঠেছে।

বিমল ঝড়ের মতো গুহার ভিতরে ঢুকে, আবার বেরিয়ে এসে বললে, গুহার ভিতরে তো কেউ নেই। কুমার, কুমার।

কেউ সাড়া দিলে না।

আমিও চেঁচিয়ে ডাকলুম, কুমার। কমল।

কোনও সাড়া পেলুম না!

বিমল করুণস্বরে বললে, এত রক্ত কীসের বিনয়বাবু, এত রক্ত কীসের? তবে কি তারা আর বেঁচে নেই?

আমি বললুম, হয়তো তারা সমুদ্রের ধারে গিয়েছে! এস পাহাড় থেকে নেমে খুঁজে দেখি গে।

সকলে আবার পাহাড় থেকে নেমে গেলুম। কিন্তু নীচে গিয়ে দেখলুম, সমুদ্রের ধারে জনমানব নেই।

বিমল মাথায় হাত দিয়ে সেইখানেই বসে পড়ল, রামহরি চিৎকার করে কেঁদে উঠল, বাঘাও সেই সঙ্গে যোগ দিয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে কাঁদতে লাগল, কেঁউ, কেঁউ, কেঁউ।

হঠাৎ বালির উপর আবার চোখ পড়ল। তাড়াতাড়ি বিমলকে ডেকে আমি বললুম, দেখো এ আবার কী ব্যাপার?

কী বিনয়বাবু, কি?

পায়ের দাগ।

পায়ের দাগ। কার পায়ের দাগ?

মানুষের।

তাই তো, একটা দুটো নয়, এ যে অনেকগুলো। এ আবার কি রহস্য বিনয়বাবু?

বেশ বোঝা যাচ্ছে এখানে একদল মানুষ এসেছিল।

কিন্তু আমরা ছাড়া এ দ্বীপে তো আর মানুষ নেই।

নিশ্চয় আছে, নইলে মানুষের পায়ের দাগ এখানে এল কেমন করে? বিমল কাল রাত্রে আমরা ভুল শুনিনি, বনের ভিতরে কাল নিশ্চয়ই মানুষ আর্তনাদ করেছিল।

বিমল নিষ্পলক নেত্রে বালির উপরে আঁকা সেই পদচিহ্নগুলোর দিকে তাকিয়ে নির্বাকভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

.

চোখের মায়া

এ দ্বীপেও তাহলে মানুষ আছে!

কাল রাত্রেই, সেই ভয়ানক বনের নিবিড় অন্ধকারের ভিতরে বসে এই সন্দেহটা প্রথমে আমার মনের ভিতরে জেগে উঠেছিল। তারপর আজকে বালির উপরে এই পায়ের দাগ! এ দাগগুলো যে মানুষেরই পায়ের ছাপ, তাতে আর কোনওই সন্দেহ নেই!

এতদিন যে দ্বীপকে জনহীন বলে মনে করতুম আজ সেখানে মানুষ আছে জেনে প্রথমটা আমার মন পুলকিত হয়ে উঠল! কিন্তু তারপরেই মনে হল এখানে মানুষ থাকলেও তারা কি আমাদের বন্ধু হবে? তারা কি আমাদেরই মতো সভ্য? এই যে কমল আর কুমারের কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না, এ ব্যাপারের সঙ্গে কি তাদের কোনওই সম্বন্ধ নেই?

কুমার আর কমল কোথায় গেল? বাঘার সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত, গুহার সামনেটা রক্তে ভেসে গেছে, এখানে অজানা মানুষের পায়ের দাগ, এসব দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে এখানকার মানুষরা হয় তাদের বন্দি, নয় হত্যা করেছে।

রামহরি আকুল কণ্ঠে বললে, বাবু, বাবু! নিশ্চয় কোনও রাক্ষুসে জানোয়ার এসে কুমার আর কমলবাবুকে খেয়ে ফেলেছে।

বিমল এতদূর অভিভূত হয়ে পড়েছিল যে, সে আর কোনও কথাই কইতে পারলে না, দুই হাতে মুখ ঢেকে বালির উপরে হেঁটে হয়ে বসে রইল।

আমি তার হাত ধরে নাড়া দিয়ে বললুম, বিমল, ওঠো, ওঠো!

বিমল মুখ তুলে হতাশ ভাবে বললে, উঠে কী করব বিনয়বাবু?

আমি বললুম, কুমার আর কমলকে খুঁজতে যেতে হবে যে!

অশ্রুপূর্ণনেত্রে বিমল বললে, আর কি তারা বেঁচে আছে!

আমি বললুম, আমার বিশ্বাস তারা মরেনি, এই বালির ওপরে যাদের পায়ের দাগ। রয়েছে, তারাই তাদের ধরে নিয়ে গেছে।

শুনেই বিমলের হতাশ ভাব চলে গেল। একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে সে বললে, এ কথা তো এতক্ষণ আমার মনে হয়নি! চলুন তবে! তারা যদি বন্দি হয়ে থাকে তাহলে তাদের উদ্ধার করতেই হবে!

আমি বললুম, দাঁড়াও বিমল এতটা ব্যস্ত হলে চলবে কেন? আগে আমরা খাওয়াদাওয়া সেরে নি?

বিমল বললে, বন্ধুরা শত্রুর হাতে এখন আমরা পেটের ভাবনা ভাবব!

আমি বললুম, না ভাবলে তো উপায় নেই ভাই! কাল থেকে অনাহারে আছি, আজ কিছু না খেলে শরীর আমাদের ভার বইতে রাজি হবে কেন? কুমার আর কমলের খোঁজে পথে পথে এখন কদিন কাটবে কে বলতে পারে?

অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে বিমল আমাদের সঙ্গে আবার গুহার ভিতরে ফিরে এল। রামহরি সেকেলে ডানাহীন হাঁসগুলোর পালক ছাড়িয়ে তাড়াতাড়ি উনুনে আগুন দিলে...।

যেমন তেমন করে খানিকটা সিদ্ধ মাংস খেয়ে এবং পথে খাবার জন্যে আর খানিকটা মাংস সঙ্গে নিয়ে আমরা তিনজনে যখন আবার বেরিয়ে পড়লুমসূর্য তখন পশ্চিমে নামতে শুরু করেছে।

আমার ইচ্ছা ছিল আজ বিশ্রাম করে কাল ভোরবেলায় কুমার আর কমলের খোঁজে বেরিয়ে পড়ব। কিন্তু এটুকু দেরিও বিমলের সইল না। অথচ সে একবারও ভেবে দেখলে না। যে, ঘণ্টায় পরে রাত হতেই আমাদের পথের মধ্যেই নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে হবে– কারণ বেলা থাকতে-থাকতে এই অল্প সময়ের মধ্যে নিশ্চয়ই আমরা কুমার আর কমলের কোনও খোঁজই পাব না!

সমুদ্রের তীরে গিয়ে বালির উপরে সেই পদচিহ্নগুলো দেখে আমরা অগ্রসর হতে লাগলুম। বাঘা কিছুতেই একলা গুহার ভিতরে থাকতে রাজি হল না, কাজেই তাকেও সঙ্গে নিতে হয়েছে। সে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে আমাদের আগে-আগে চলল।

পাহাড় আর সমুদ্রের মাঝখান দিয়ে বালির উপরে অসংখ্য পায়ের দাগ বরাবর চলে গেছে। দাগগুলো এত স্পষ্ট যে অনুসরণ করতে আমাদের কোনওই কষ্ট হল না। দ্বীপের যেদিকে যাচ্ছি এদিকে আমরা আগে আর কখনও আসিনি, এদিকটায় যতদূর চোখ চলে দেখতে পাচ্ছি খালি পাহাড়ের পর পাহাড়! অধিকাংশ পাহাড়ই ছোট-ছোট–নব্বই কি একশো ফুটের বেশি উঁচু নয়। সেই সব পাহাড়ের মাঝে মাঝে ছোটবড় বনজঙ্গল। চলতে-চলতে আমার মনে হতে লাগল দ্বীপের এই অজানা অংশে হয়তো সেকালের আরও কতরকমের ভীষণ জীব বাস করে। আজ রাত্রেই হয়তো তাদের অনেকের সঙ্গে দেখাশুনো হয়ে যাবে, কালকের মতো আজ রাত্রেও হয়তো প্রতিমুহূর্তেই চোখের সামনে মৃত্যু এসে মূর্তি ধরে দাঁড়াবে! এসব কথা ভাবতেও মন। হাঁপিয়ে উঠতে লাগল–এমন নিত্য নব বিপদের সঙ্গে যুঝে যুঝে বেঁচে থাকাও আমার কাছে। যেন মিথ্যা বলে মনে হল না আছে আনন্দ, না আছে শান্তি, না আছে দু-দণ্ড বিশ্রাম–একে কি আর জীবন বলে? এই তো আমাদের দুজনকে আর দেখতে পাচ্ছি না, আর দেখতে পাব কিনা তাও জানি না, এমনি বিপদের মধ্যে দিয়ে যেতে-যেতে একে একে আমাদেরও লীলাখেলা সাঙ্গ হয়ে যাবে–

দেশের কেউ আমাদের কথা জানতেও পারবে না, মরবার সময়ে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের মুখ পর্যন্ত দেখতে পাব না!

ভাবতে-ভাবতে পথ চলছি। বিমল আর রামহরির মুখেও কোনও কথা নেই, তারাও বোধহয় আমারই মতো ভাবনা ভাবছে! ঘণ্টা-দুই পরে সূর্য পশ্চিম আকাশের মেঘের দরজা খুলে অদৃশ্য হয়ে গেল, সমুদ্রের নীলজলের উপরে আসন্ন সন্ধ্যার ছায়া ধীরে-ধীরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

আরও খানিকক্ষণ চলবার পরে আমরা যে জায়গায় এসে দাঁড়ালুম তার দুদিকে দুটো পাহাড় আর মাঝখানে অরণ্য। পায়ের দাগ বেঁকে সেই বনের ভিতরে চলে গেছে।

আমি বললুম, বিমল সামনেই রাত্রি এখন এ-বনের ভিতরে যাওয়া কি উচিত?

বিমল বললে, না গেলেও তো চলবে না।

আমি বললুম, কিন্তু গিয়েও তো কোনও লাভ নেই। অন্ধকারে পায়ের দাগ দেখা যাবে না, আমরা যদি নিজেরাই কালকের মতো আবার পথ হারিয়ে ফেলি, তা হলে কুমার আর কমলকে উদ্ধার করবে কে?

বিমল বললে, তাহলে উপায়?

আমার মতে আজকের রাতটা এই পাহাড়ের উপরে উঠে কোনওরকমে কাটিয়ে দেওয়া উচিত। তারপর কাল ভোরে বনের ভিতরে ঢুকলেই চলবে।

রামহরিও আমার মতে সায় দিলে।

বিমল একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, আচ্ছা।

ঠিক সেই সময়ে বাঘা হঠাৎ গোঁ-গোঁ করে গর্জে উঠল। আমি সচমকে চারিদিকে তাকালুম কিন্তু কোথাও কিছু দেখতে পেলুম না। বাঘার মাথায় একটা চাপড় মেরে আমি বললুম, চুপ কর বাঘা, চুপ কর।

সে কিন্তু চুপ করলে না, আরও কয় পা এগিয়ে গিয়ে তেমনি গজরাতে লাগল।

রামহরি বললে, বাঘা নিশ্চয় কিছু দেখেছে, ও তো মিথ্যে চ্যাঁচায় না।

কিন্তু কি দেখেছে বাঘা? এদিকে-ওদিকে তাকাতে-তাকাতে হঠাৎ জঙ্গলের এক জায়গায় আমার নজর পড়ল কারণ সেখানকার গাছপালা অল্প অল্প কাঁপছিল।

দু-পা এগিয়েই আমি চমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম। সভয়ে দেখলুম গাছের পাতার ফাঁকে অন্ধকারের ভিতর থেকে দুটো ভীষণ চোখ জ্বলজ্বল করছে। সে ক্রুর চোখের দৃষ্টি কী নিষ্ঠুর কী তীব্রতার মধ্যে লেশমাত্র দয়ামায়ার ভাব নেই! কে ওখানে গাছের আড়ালে বসে অমন লোলুপ নেত্রে আমাদের পানে তাকিয়ে আছে–সে কি জানোয়ার, মানুষ, না পিশাচ?

সে চোখ দুটোর মধ্যে কি সাংঘাতিক আকর্ষণ ছিল জানি না, কিন্তু নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও আমি পায়ে-পায়ে তার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলুম। শুনেছি সাপেরা কেবল চোখের চাউনি দিয়ে গাছের ডাল থেকে পাখিদের মাটির উপরে টেনে এনে ফেলে–আমারও সেই অবস্থা হল নাকি?

সেই ভয়ানক চোখের আকর্ষণে আচ্ছন্নের মতো এগিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ পিছনে থেকে বিমল ডাকলে, বিনয়বাবু, বিনয়বাবু!

.

রামহরির মহাদেব বন্দনা

বিমলের চিৎকারে আমার সাড় হল আমার চমক ভেঙে গেল, শিউরে উঠে আমি দাঁড়িয়ে পড়লুম। বুঝতে পারলুম সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যাচ্ছিলুম।

বিমল তাড়াতাড়ি এসে আমার হাত চেপে ধরে বললে, অমন করে বনের ভেতরে ঢুকেছিলেন কেন?

বনের ভেতরে, গাছের ফাঁকে দুটো ভয়ানক চোখ দেখছি। তোমরা কি কিছুই দেখতে পাওনি?

বিমল আশ্চর্য স্বরে বললে, চোখ। কই, কোথায়?

ওই যে ওইখানে! আঙুল তুলে বিমলকে জায়গাটা দেখিয়ে দিতে গিয়ে দেখি সেই নিষ্ঠুর চোখদুটো আর সেখানে নেই। কিন্তু বাঘা তখনও জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করছিল।

আচ্ছা, আমি জঙ্গলের ভেতরটা একবার দেখে আসি! বলেই বিমল অগ্রসর হল, কিন্তু রামহরি তাড়াতাড়ি বিমলের পথরোধ করে দাঁড়িয়ে বললে, না, না, সে কিছুতেই হবে না! জঙ্গলের ভেতরে নিশ্চয়ই ভূত আছে!

বিমল বললে, ভূত কি তোমার ঘাড় থেকে কখনও নামবে না, রামহরি। পথ ছাড়ো, আমাকে দেখতে দাও।

আমি বললুম, বিমল, এই ভরসন্ধেবেলায় তুমি আর গোঁয়ারতুমি কোরো না। জঙ্গ লের ভেতরে কী আছে, আজ আর তা দেখবার দরকার নেই। এসো, এইবেলা আলো থাকতে থাকতে পাহাড়ের ওপরে উঠে রাত কাটাবার ব্যবস্থা করি!

অগত্যা বিমলকে আমার প্রস্তাবে রাজি হতে হল! আমরা সকলে পাহাড়ে চড়তে শুরু করলুম। পাহাড়টা বেশি উঁচু নয়, তার মাথায় উঠতে আমাদের বিশেষ বেগ পেতে হল না। উপরে গিয়ে একটা জায়গায় শ্রান্ত দেহে আমরা বসে পড়লুম। পৃথিবীর বুকের উপরে

সন্ধ্যা তখন তার আঁধার অঞ্চল ধীরে ধীরে বিছিয়ে দিতে শুরু করেছে–অদূরে সমুদ্রের নীল রং। ছায়ার মায়ায় ক্রমেই ঝাপসা হয়ে আসছে। আকাশ এখানে ঠিক আমাদের দেশের মতোই সুন্দর এই দ্বীপের কোনও বিভীষিকার আভাস তার নীলিমাকে ম্লান করে দেয়নি। তবে বাংলাদেশে সন্ধ্যার সাড়া পেয়ে বকের দল তেমন নীলসায়রে শ্বেতপদ্মের মালার মতো দুলতে-দুলতে ভেসে যায়, সে ছবি এখানে কেউ দেখতে পায় না।

পাহাড়ের পাশের বনের দিকে তাকিয়ে একটি নতুনত্ব চোখে পড়ল। এই বনের যেমন বড় বড় গাছ আছে, দ্বীপের আর কোথাও তা নেই। অনেক গাছ আমাদের পাহাড়েরও মাথা ছাড়িয়ে চারিদিকে ডাল-পাতা বিস্তার করে শূন্যের দিকে উঠে গেছে–গাছ যে এত উঁচু হতে পারে আগে আমার সে ধারণা ছিল না। এসব গাছের নাম বা জাতও আমার জানা নেই।

রাতটা নিরাপদেই কেটে গেল জলাভাব ছাড়া আর কোনও কষ্ট আমাদের ভোগ করতে হল না।

সকালবেলায় পূর্বাকাশের নীলমুখ সবে যখন রাঙা হয়ে উঠেছে আমরা তখন পাহাড় থেকে আবার নীচে নেমে এসে দাঁড়ালুম।

কাল যে জঙ্গলের ভিতরে সেই চোখ দেখেছিলুম, আগেই বাঘা তার কাছে ছুটে গেল! তারপর জঙ্গলের আশপাশ খুব সন্তর্পণে গলা বাড়িয়ে দেখে এবং ভালো করে শুঁকে আবার সে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে আমাদের কাছে শান্ত ভাবে ফিরে এল–বাঘার হাবভাব দেখেই আমরা বুঝতে পারলুম যে, জঙ্গলের ভিতরে আজ আর কোনও শত্রু লুকিয়ে নেই।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আমরা সেই দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করলুম। সে অরণ্য গভীর বটে কিন্তু খুব নিবিড় নয় তার উপরে দুধারের বড় বড় গাছের মাঝখান দিয়ে, সুন্দর একটি পায়ে-চলা পথের রেখা এঁকেবেঁকে বরাবর চলে গেছে। তারা এই বনের ভিতরে এমন পথের সৃষ্টি করেছে? নিয়মিত ভাবে আনাগোনা না করলে এমন পথ কখনও তৈরি হতে পারে না, কিন্তু কারা এখান দিয়ে আনাগোনা করে? আমাদের মনের

ভিতরে কেবলই এই প্রশ্ন উঠতে লাগল, কিন্তু এ বিচিত্র রহস্যের কোনওই কিনারা করে উঠতে পারলুম না!

সেই পথ ধরেই অগ্রসর হতে লাগলুম। চারিদিকে গাছপালা আর বনজঙ্গল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাঝে মাঝে অল্প হাওয়ায় ভোরের আলোতে চিকণ গাছের পাতাগুলো অস্ফুট আর্তনাদের মতো অস্পষ্ট আওয়াজ করে কেঁপে কেঁপে উঠছে মাত্র, তা ছাড়া আর কোনও দিকেই কোনও জীবের লক্ষণ নেই! এ নিস্তব্ধতা কেমন যেন অস্বাভাবিক। বনের আশেপাশে রোদের সোনালি আভা দেখে আমাদের মনে হতে লাগল, গভীর রাত্রির নীরবতার মাঝখানে সে যেন চোরের মতো চুপিচুপি ঢুকে পড়েছে। তার উপর আর এক অসোয়াস্তি। সেই অতিকায়। সেকেলে জীবের অরণ্যের মধ্যে ঢুকে আমাদের মনে যে অমানুষিক বিভীষিকার ভাব জেগে উঠেছিল, এখানেও বুকের ভিতরে তেমনি একটা আতঙ্কের আভাস জাগতে লাগল। কে যেন লুকিয়ে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসছে, কারা যেন আড়াল থেকে আমাদের সর্বাঙ্গে ক্ষুধিত চোখের চাউনি বুলিয়ে দিচ্ছে। সামনে, পিছনে ডাইনে, বাঁয়ে, উপরে নীচে সব দিকেই তাকিয়ে দেখি, কিন্তু জনপ্রাণীকেও দেখতে পাই না,–অথচ ভয় যায় না, গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, থেকে থেকে চমকে দাঁড়িয়ে পড়ি। এ যে আমাদের মনের মিথ্যে ভ্রম তাও তো বলতে পারি কারণ অবোধ পশু বাঘা, সেও চলতে-চলতে হঠাৎ স্থির হয়ে দাঁড়াচ্ছে, কান পেতে কি যেন শুনছে আর মাঝে মাঝে গোঁ-গোঁ করে গজরে উঠছে! স্পষ্ট দিনের আলোতেও যে এমন একটা অজানা আতঙ্ক মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করে দিতে পারে, আগে আমার সে বিশ্বাস মোটেই ছিল না।

এমনি ভয়েভয়ে প্রায় ক্রোশখানেক পথ পার হয়ে একটা ভোলা মাঠের ধারে এসে পড়লুম! সামনে থেকে গাছপালার সবুজ পরদা সরে গিয়ে দেখা দিলে এক অপূর্ব কল্পনাতীত দৃশ্য।

মাঠের একপাশে আবার এক বিশাল হ্রদ–প্রভাত-সূর্যের মায়াকিরণে তার অগাধ জলরাশি তরলিত মণিমাণিক্যের মতো বিচিত্র হয়ে উঠেছে। হ্রদের মাঝখানে ঠিক যেন ছবিতে আঁকা, তরুলতা দিয়ে ঢাকা ছোট্ট একটি ছায়া-মাখা দ্বীপ এবং সেই দ্বীপের শ্যামলতা

ভেদ করে মাথা তুলে জেগে আছে পিরামিডের মতো একটি পাহাড়! সবচেয়ে অবাক ব্যাপার এই যে, পাহাড়ের বুকের ভিতর থেকে মাঝে মাঝে অসংখ্য আগুনের লকলকে শিখা হু হু করে বাইরে বেরিয়ে আসছে ঠিক যেন রাশি রাশি অগ্নিময় সর্প মহাক্রোধে কোনও এক অদৃশ্য শত্রুকে থেকে থেকে ছোবল মেরে আবার গর্তের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। হ্রদের জলে সেই অগ্নিলীলার ছায়া পড়ে দৃশ্যটাকে করে তুলছে আরও চমকপ্রদ।

আমরা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম-এমন অদ্ভুত দৃশ্য আর কখনও চোখে দেখিনি-এ দৃশ্য যেমন আশ্চর্য, তেমনি সুন্দর, তেমনি গম্ভীর।

রামহরি হঠাৎ সেইখানে শুয়ে পড়ে দণ্ডবৎ হয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করলে।

আমি বললুম, ও কী রামহরি, প্রণাম করলে কাকে?

রামহরি উঠে বসে বললে, আজ্ঞে, দেবতাকে!

দেবতা। কোথায় দেবতা?

সম্ভ্রমের সঙ্গে পাহাড়ের দিকে আঙুল তুলে রামহরি বললে, ওই যে, দেবতা ওইখানে আছেন।

আমি হেসে ফেলে বললুম, ওটা তো আগ্নেয়গিরি। তোমার প্রণামটা যে বাজে খরচ হল রামহরি।

কিন্তু রামহরি আমার কথায় বিশ্বাস করলে না। তাড়াতাড়ি জিভ কেটে বললে, ছি, ছি, অমন কথা বলবেন না বাবু! ইংরিজি কেতাব পড়ে আপনারা সব ক্রিশ্চান হয়ে গেছেন, দেবতা টেবতা মানেন না, সেই পাপেই তো এত বিপদে পড়ছেন। ওখানে, মহাদেব আছেন, ও আগুন যে তারই চোখের আগুন-ওই আগুনেই তো মদন ভস্ম হয়েছিল, হে বাবা মহাদেব, তুমি আমার বাবুদের অপরাধ নিও না বাবা। বলেই আবার সে মাটির উপরে ভক্তিভরে কপাল ঠুকতে লাগল।

বিমলের কিন্তু এসব কিছুই ভালো লাগছিল না, সে অস্থির ভাবে বারকয়েক এদিকে ওদিকে ঘোরাঘুরি করে আমার কাছে এসে বললে, এখনও তো কুমার আর কমলের কোনওই খোঁজ পাওয়া গেল না।

আমি বললুম না, না। কিন্তু আমার বিশ্বাস, তারা এই বনের ভেতরেই আছে।

বিমল নিরাশ কণ্ঠে বললে, আমার বিশ্বাস, তারা আর বেঁচে নেই। বিনয়বাবু তাদের এই অকাল মৃত্যুর জন্যে আমরাই দায়ী। গুহার ভেতরে নিরস্ত্র অবস্থায় তাদের যদি ফেলে না রেখে যেতুম, তাহলে কখনওই এমন দুর্ঘটনা ঘটত না–

আচম্বিতে বাঘা চেঁচিয়ে উঠল, আমি চোখের পলকে ফিরে দাঁড়ালুম। ও আবার কি দৃশ্য? প্রকাণ্ড এক গাছের তলায় সারি সারি ওরা কারা এসে দাঁড়িয়েছে? মানুষের মতো তারা দাঁড়িয়ে আছে, মানুষের মতোই তাদের হাত-পা দেহ কিন্তু তারা মানুষ নয়। জাদুঘরে আমি গরিলার মূর্তি দেখেছি, এদেরও দেখতে অনেকটা সেইরকম, কিন্তু এরা গরিলাও নয়! এদের রং কালো, পায়ে বড় বড় লোম, হাতগুলো এত লম্বা যে প্রায় হাঁটুর কাছে এসে পড়েছে। দেহের তুলনায় এদের মাথাগুলো ছোট ছোট, মুখশ্রী প্রায় মানুষের মতো বটে, কিন্তু ভয়ানক কুৎসিত, নাক চ্যাপ্টা, আর মুখের আধখানা দাড়ি-গোঁপে ঢাকা। এদের চেহারা মানুষ আর বনমানুষের মাঝামাঝি। পণ্ডিতেরা যে বানরমানুষের কথা লিখেছেন, তবে কি এরা তাই?

পাশের আর একটা গাছের ডালপাতার ভিতর থেকে ঝুপঝুপ করে আরও অনেকগুলো বানরমানুষ পৃথিবীর উপরে অবতীর্ণ হল–প্রত্যেকেরই হাতে এক এক গাছা মোটা লাঠি। তারপর আর একটা গাছ থেকে আরও কতকগুলো জীব মাটির উপরে এসে দাঁড়াল–এমনি করে তারা ক্রমেই দলে ভারী হয়ে উঠতে লাগল।

আমি বললুম, বিমল, এরাই হচ্ছে মানুষের পূর্বপুরুষ। কিন্তু এরা বোধহয় আমাদের আক্রমণ করতে চায়।

বিমল কোনও জবাব না দিয়ে বন্দুকটা কাঁধের উপর থেকে নামিয়ে বেশ করে বাগিয়ে ধরল।

.

অতিকায় শ্লথ

এই বানরমানুষরা যে আমাদের আক্রমণ করতে চায় সে বিষয়ে আর কোনওই সন্দেহ রইল না। ক্রমে ক্রমে দলে ভারী হয়ে তারা আমাদের একেবারে ঘিরে ফেলবার চেষ্টা করলে। তারা নানান রকম অঙ্গভঙ্গি ও চিৎকার করে কীসব বলতে লাগল,–সেগুলো অর্থহীন শব্দ, অথবা তাদের ভাষা, তাও বুঝতে পারলুম না।

আমি বললুম, বিমল যদি বাঁচতে চাও, দৌড়ে ওই হ্রদের ধারে চলো। নইলে এরা আমাদের একেবারে ঘিরে ফেলে আর বাঁচবার উপায় থাকবে না।

বিমল বললে, হুঁ।

কিন্তু বানরমানুষরাও বোধহয় আমাদের উদ্দেশ্য বুঝে ফেললে। কারণ আমরা হ্রদের দিকে ফিরতে না ফিরতেই ভয়ানক চিৎকারে আকাশ কাঁপয়ে তারা আমাদের আক্রমণ করলে।

সঙ্গে সঙ্গে বিমলও কিছুমাত্র ইতস্তত না করে বন্দুক ছুড়লে, আমিও আমার বন্দুকের ঘোড়া টিপলুম-অব্যর্থ লক্ষ্যে দুটো জীব তৎক্ষণাৎ মাটির উপরে হাত-পা ছড়িয়ে আছড়ে পড়ে ছটফট করতে লাগল।

বন্দুকের গর্জনে আর সঙ্গী দুজনের অবস্থা দেখে বাকি বানরমানুষগুলো হতভম্ব ও মূর্তির মতো নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। জীবনে তারা আগ্নেয় অস্ত্র কখনও তো চোখে দেখেনি, কোন মায়ামন্ত্রে আমরা যে তাদের দুই সঙ্গীর অমন দুরবস্থা করলুম এটা বুঝতে না পেরে ভয়ে ও বিস্ময়ে নিশ্চয় তারা অবাক হয়ে গেল।

সেই ফাঁকে আমরা হ্রদের দিকে ছুট দিলুম। প্রায় যখন জলের কাছাকাছি এসে পড়েছি, তখন আবার আর এক বিপদ। হ্রদের উপরে কয়েকখানা ছিপের মতো লম্বা নৌকো ভাসছে এবং প্রত্যেক নৌকোর মধ্যে মানুষের মতো দেখতে অনেকগুলো করে লোক!

নৌকোগুলো তিরের বেগে অর্থাৎ আমাদের দিকে ছুটে আসছে। নিশ্চয়ই আরও একদল বানরমানুষ জলপথ আগলে আছে। ভেবেছিলুম সাঁতরে হ্রদের ওই দ্বীপে গিয়ে উঠে প্রাণ বাঁচাব, কিন্তু এখন তো দেখছি সে পথও বন্ধ।

পিছনে ফিরে দেখি মাঠের উপরের বানরমানুষদের দল আরও পুরু হয়ে উঠেছে। আহত সঙ্গী দুজনের চারপাশ ঘিরে তাদের অনেকে উত্তেজিত ভাবে অঙ্গভঙ্গি করছে,–অনেকে আবার আমাদের লক্ষ করে বিকট স্বরে চিৎকার ও লাঠি আস্ফালন করতেও ছাড়ছে না।

আমাদের তরফ থেকে বাঘাও লাঙ্গুল আস্ফালন করে তাদের চিৎকারের উত্তর দিতে লাগল।

রামহরি বললে, বাবু, এখন আমরা কোনদিকে যাই?

বিমল বললে, আবার বনের ভেতর চলো। সেখানে হয়তো লুকোবার একটা জায়গা পাওয়া যেতে পারে!

তা ছাড়া আর উপায়ও নেই। বিশেষত বনের ভিতরে আত্মরক্ষারও সুবিধা বেশি। বন খুব কাছেই ছিল, আমরা আবার ছুটে তার মধ্যে গিয়ে ঢুকলুম–মাঠ ও নৌকো থেকে শত্রুরা উচ্চস্বরে চিৎকার করে উঠল।

একটা কোনও গোপন স্থান খোঁজবার জন্যে আমরা বনের চারিদিকে ছুটাছুটি করতে লাগলুম। কিন্তু সেখানে আবার এক নতুন আতঙ্ক! লুকোবার ঠাঁই খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ বনের এক জায়গায় দেখি, দোতলা বাড়ির চেয়েও উঁচু একটা অতিকায় ভীষণ জানোয়ার দুই পা ছড়িয়ে বসে আছে এবং দুই হাত বাড়িয়ে মস্ত একটা গাছ অতি অনায়াসে মড়মড় করে ভেঙে ফেলেছে। দেখতে তাকে অনেকটা ভল্লুক ও বনমানুষের মাঝামাঝি!

বিস্ময়ে-স্তম্ভিত নেত্রে বিমল বললে, ও কী সর্বনেশে জন্তু?

আমি বললুম, অতিকায় শ্লথ!

ও যদি আমাদের দেখতে পায়, তাহলে যে তার রক্ষা থাকবে না!

এর চেয়ে যে বানরমানুষদের সঙ্গে লড়াই করা ভালো! এসো, এসো পালিয়ে এসো!

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আবার বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলুম!

রামহরি বললে, যেদিকে যাই সেই দিকেই বিপদ, এবারে সত্যি বুঝি প্রাণটা গেল।

বিমল হেসে বললে, কই রামহরি, তোমার মহাদেবকে আর ডাকছ না কেন? আর একবার ডেকে দেখো, যদি তিনি এ বিপদ থেকে আমাদের উদ্ধার করতে পারেন।

রামহরি রেগে বললে, মরতে বসেছ খোকাবাবু এখনও দেবতা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা। হে বাবা মহাদেব! খোকাবাবু ছেলেমানুষ, তার অপরাধ ক্ষমা করো–বলেই হাতজোড় করে কপালে ছোঁয়ালে।

বিমল বললে, কিন্তু কী আশ্চর্য, বানরমানুষগুলো অবাক হয়ে কি দেখছে? ওরা যে এখনও আমাদের আর আক্রমণ করলে না? ওরা কি আমাদের বন্দুকের ভয়েই আর এগুচ্ছে না?

আমি বললুম, ওরা সবাই হ্রদের নৌকাগুলোর দিকেই তাকিয়ে আছে! বোধহয় ওরা নৌকাগুলো ডাঙায় আসার জন্যে অপেক্ষা করছে! নৌকা ডাঙায় এলেই ওরা একসঙ্গে দুই দিক থেকে আমাদের আক্রমণ করবে।

বিমল বললে, নৌকোর ওপরেও গুলি চালাব নাকি?

না, নৌকোগুলো এখনও দূরে আছে, বন্দুক ছুড়লে হয়তো ফল হবে না। বন্দুক যদি ছুঁড়তে হয় তো মাঠের দিকেই ছুড়ো, আরও দু-একজন মরলে বাকি বানরমানুষগুলো ভয়ে পালিয়ে যেতে পারে!

তাই ভালো।

আমরা দুজনেই শত্রুদের লক্ষ করে বার কয়েক বন্দুক ছুড়লুম। যা ভেবেছি তাই! বন্দুকের মারাত্মক শক্তি দেখে অনেকগুলো বানরমানুষ লাফ মেরে আবার গাছের উপরে উঠে ঘন পাতার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল, অনেকে বনের ভিতরে ঢুকে পড়ল, মাঠের উপরে রইল খালি পাঁচ-ছয়টা আহত বা মৃতদহ। কিন্তু শত্রুদের ঘন ঘন চিৎকার শুনেই বুঝলুম, তারা আমাদের আশা একেবারে ত্যাগ করে পালিয়ে যায়নি–আড়ালে-আড়ালে ওঁত পেতে বসে আছে।

হ্রদের দিকে তাকিয়ে বিমল বললে, এইবার এদের ব্যবস্থা করতে হবে।

কিন্তু বিমল, নৌকোর ওপরে ওরা কারা রয়েছে ওদের তো বানরমানুষ বলে মনে হচ্ছে না!

হ্যাঁ, তাই তো! ওরা তো বানরমানুষদের মতো ল্যাংটো নয়–ওদের পরনে জামাকাপড়ের মত কি যেন রয়েছে না?

হ্যাঁ! বোধহয় ওরা আমাদেরই মতো মানুষ।

সংখ্যায় তো দেখছি ওরা চল্লিশ-পঞ্চাশ জনের কম নয়! তাহলে এখানে আমরা ছাড়া আরও মানুষ আছে! কিন্তু কী মতলবে ওরা আমাদের কাছে আসছে? ওরা শত্রু না মিত্র?

কিছুই তো বুঝতে পারছি না! হয়তো ওরা অসভ্য মানুষ, হ্রদের ওই দ্বীপে থাকে।

নৌকোগুলো ডাঙার খুব কাছে এসে পড়ল। একখানা নৌকোর উপরে হঠাৎ দুজন লোক দাঁড়িয়ে উঠল এবং দু-হাত তুলে চিৎকার করে ডাকল–বিমল! রামহরি! বিনয়বাবু। বাঘা!

শুনেই বাঘা তিরের মতো হ্রদের দিকে ছুটে গেল! আনন্দে আমাদেরও বুক যেন নেচে উঠল–এ যে কুমার আর কমলের গলা!

আমরাও এক দৌড়ে হ্রদের ধারে গিয়ে দাঁড়ালুম। সঙ্গে-সঙ্গে একখানা নৌকা থেকে কুমার আর কমল ডাঙায় লাফিয়ে পড়ল এবং বাকি নৌকোগুলো থেকেও উল্লসিত কণ্ঠে উচ্চ চিৎকার শুনলুম–বিনয়বাবু, বিনয়বাবু!

আনন্দের প্রথম আবেগ সামলে দেখি, আমাদের চারপাশে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে যারা তারা কেউই অচেনা লোক নয়! তারা হচ্ছে আমাদেরই দেশের লোক, মঙ্গলগ্রহের বামনরা। বিলাসপুর থেকে তাদের বন্দি করে নিয়ে গিয়েছিল এবং এই দ্বীপে এসেই তাদের সঙ্গে আমাদের প্রথম ছাড়াছাড়ি হয়! পাঠকরাও নিশ্চয়ই তাদের কথা ভুলে যাননি?

মনের আনন্দে আমরা যখন কথাবার্তায় বিভোর হয়ে আছি, আচম্বিতে মাঠের দিক থেকে বিষম একটা গোলমাল শোনা গেল। ফিরে দেখি, বনের নানাদিক থেকে পিলপিল করে দলে-দলে বানরমানুষ বেরিয়ে আসছে। দেখতে-দেখতে হাজার-হাজার বানরমানুষে মাঠের একদিক একেবারে ভরে গেল! হঠাৎ ভীষণ হল্লা করে তারা একসঙ্গে আবার আমাদের আক্রমণ করতে অগ্রসর হল।

বিমল আবার বন্দুক তুলে ফিরে দাঁড়াল।

কুমার বললে, মিছে গোলমাল বাড়িয়ে লাভ নেই বিমল! এসো, আমরা নৌকোয় গিয়ে চড়িগে! ওরা সাঁতার জানে না, জলকে বড় ভয় করে!

আমি সায় দিয়ে বললুম, হ্যাঁ, সেই কথাই ভালো। ওদের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে যদি আমাদের কেউ মারা পড়ে, তাহলে আজকের এই মিলনের আনন্দ অনেকখানি ম্লান হয়ে যাবে।

আমরা সকলে মিলে তাড়াতাড়ি নৌকোর উপরে গিয়ে উঠে বসলুম। বানরমানুষরা যখন হ্রদের ধারে এসে দাঁড়াল, আমাদের নৌকোগুলো তখন তাদের নাগালের বাইরে গিয়ে পড়েছে। নিষ্ফল আক্রোশে আমাদের লক্ষ করে তারা কতকগুলো বড় বড় পাথর বৃষ্টি করলে, কিন্তু সেগুলো আমাদের কাছ পর্যন্ত এসে পৌঁছল না। উত্তরে আমরাও বন্দুক ছুড়লে বানরমানুষদের আরও কিছু শিক্ষা হত বটে, কিন্তু আমাদের আর বন্দুকের টোটা নষ্ট করতে প্রবৃত্তি হল না!

নৌকোগুলো হ্রদের সেই দ্বীপের দিকে ভেসে চলল।

আমি বললুম, কুমার, তোমরা কী করে এখানে এলে সে কথা তো কিছুই বললে না?

কুমার বললে, আচ্ছা শুনুন, খুব সংক্ষেপে বলে যাচ্ছি। আপনারা যেদিন শিকারের খোঁজে বেরিয়ে গেলেন, সেইদিন রাত্রেই ওই বনমানুষগুলো আমাদের আক্রমণ করে। ওরা যে কী করে আমাদের খোঁজ পেলে তা আমি জানি না। তাদের সেই হঠাৎ আক্রমণে আমরা একেবারে কাবু হয়ে পড়লুম। লাঠির ঘায়ে আমার মাথা ফেটে গেল, বাঘা রীতিমতো জখম হল। তারপরে তারা। আমাকে আর কমলকে নিয়ে নিজেদের বাসায় ফিরে এল। আমাদের নিয়ে ওরা যে কী করত তাও বলতে পারি না। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় একটা পুরো দিন আমরা এক গাছতলায় পড়ে রইলুম। বনমানুষগুলো বড় বড় গাছের উপরে লতাপাতা ডাল দিয়ে ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর বানিয়ে বাস করে। দ্বিতীয় দিন রাত্রে যখন তারা গাছের উপরে ঘুমে অচেতন, আমি তখন কোনও রকমে পকেট থেকে আমার ছুরিখানা বার করলুম। তারপর ছুরিখানা দাঁতে চেপে ধরে আগেই কমলের বাঁধন কেটে দিলুম, তারপর কমল আমাকে মুক্ত করলে। শত্রুরা টের পাওয়ার আগেই আমরা পালিয়ে

এই হ্রদের ধারে এসে উপস্থিত হলুম, তারপর সাঁতার দিয়ে একেবারে ওই দ্বীপে গিয়ে উঠলুম। ওখানে এই পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা!

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কিন্তু ওরা কী করে ওখানে এল?

কুমার বললে, সে অনেক কথা। দ্বীপে গিয়ে শুনবেন। আজ বন্দুকের আওয়াজ শুনেই আমরা বুঝতে পেরেছিলুম যে, আমাদের খোঁজে আপনারা এখানে এসেছেন।

কে যেন আকাশের নীলিমাকে নিংড়ে হ্রদের জলে গুলে দিয়েছে, কী স্বচ্ছ নীল তার রং! তার তলা পর্যন্ত আলো করে সূর্যদেবের কিরণ-প্রদীপ জ্বলজ্বল করে জ্বলছে এবং কতরকমের মাছ যে সেখানে খেলা করে বেড়াচ্ছে, তাও স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে!

আগ্নেয়গিরির আগুন-জিভগুলো এখন আমাদের চোখের খুব কাছেই লকলক করে উঠছে গাছের পর গাছের সবুজ আঁচলটাকা সেই ছায়া-নাচানো দ্বীপটিও একেবারে আমাদের কোলের সামনে এসে পড়েছে। তারপরেই আমাদের নৌকোগুলো একে একে তীরে গিয়ে ভিড়ল।

দ্বীপে যে লোকগুলি আশ্রয় নিয়েছে তাদের সর্দার ছিল সোনাউল্লা। দ্বীপে নেমে আমাকে সেলাম ঠুকে সে বললে, বাবুজি, আজ আগেই আপনাদের খাওয়াদাওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে তো?

হ্যাঁ সোনাউল্লা, তাহলে বড় ভালো হয়-আমাদের ভারি খিদে পেয়েছে। তুমি তাড়াতাড়ি যাহোক কিছু বেঁধে আমাদের খাইয়ে দাও!

কিন্তু বাবুজি, আমরা যে মুসলমান!

ভাই সোনাউল্লা, আমরা এখন ভগবানের নিজের রাজত্বে বাস করছি...হয়তো এইখানেই আমাদের চিরকাল বাস করতে হবে। এখানে কেউ হিন্দুও নয়, কেউ মুসলমানও নয়-এখানে শুধু এক জাত আছে, সে হচ্ছে মানুষজাত! দলাদলিতে মানুষ যেসব জাতের সৃষ্টি

করছে এখানে আমরা তা মানব না। তুমি যাও সোনাউল্লা, আগে তোমার হাতের রান্না খেয়ে পেট ঠান্ডা করি, তারপর তোমাদের কাহিনি শুনব।

.

খাঁড়া-দেঁতো বাঘ

আহারাদির পর একটা গাছতলায় পা ছড়িয়ে বসে সোনাউল্লার কাহিনি শুনতে লাগলুমঃ

বাবুজি, বামনদের উড়োজাহাজ যেদিন আবার পৃথিবীতে এসে নামল, আমাদের আর আনন্দের সীমা রইল না। তাই আপনারা উড়োজাহাজ ছেড়ে যখন নেমে গেলেন, তখন আমরাও আর থাকতে না পেরে নীচে নেমে পড়লুম। এই ফাঁকে বামনরা যে পালাতে পারে, মনের আনন্দে কারুরই আর সে কথা মনে রইল না।

আপনাদের বোধহয় স্মরণ আছে, তখনও ভালো করে ভোর হয়নি। মনের খুশিতে নাচতে নাচতে, লাফাতে লাফাতে, চাঁচাতে-চাচাতে আমরা চারিদিকে ছুটাছুটি করতে লাগলুম। বললে আপনারা বিশ্বাস করবেন না, ঠিক সেই সময়ে ভয়ানক একটা কাণ্ড ঘটল। আধা আলোয় আধা আঁধারে জঙ্গলের ভিতর থেকে হঠাৎ প্রকাণ্ড কি একটা বেরিয়ে এল-আমাদের মনে হল যেন একটা পাহাড় লাফাতে লাফাতে ছুটে আসছে।

প্রথমটা আমরা আতঙ্কে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম, তারপরে পাগলের মতো সকলে মিলে ছুটতে লাগলুম। সেই রাক্ষসটাও যে আমাদের পিছনে-পিছনে তেড়ে আসছে, তার পৃথিবী কাঁপানো পায়ের শব্দ শুনেই সেটা বেশ বুঝতে পারলুম। মাঝে মাঝে মানুষের কাতরানিও শোনা যেতে লাগল-নিশ্চয়ই আমাদের দলের কেউ কেউ তার কবলে পড়েছে।

আরও বেশি ভয় পেয়ে আমরা আরও বেশি বেগে দৌড়াতে লাগলুম। কিন্তু পিছনের সেই বিষম পায়ের শব্দ আর কিছুতেই যেন থামতে চায় না! এমনি ছুটতে ছুটতে বনবাদাড় ভেঙে আমরা যখন এই হ্রদের ওদিককার তীরে এসে পড়লুম, তখন আমাদের দম প্রায়

আটকে যাওয়ার মতো হয়েছে। আমরা সেইখানেই কেউ বসে আর কেউ শুয়ে পড়ে জিরুতে লাগলুম। কিন্তু বেশিক্ষণ জিরুতে হল না, হঠাৎ বাজের মতো এক ভীষণ চিৎকার শুনে ফিরে দেখি, সেই পাহাড়ের মতো উঁচু রাক্ষসটা বনের ভিতর থেকে আবার বেরিয়ে আসছে। আমরা সকলে তখন হ্রদের জলে ঝাঁপ দিলুম।

আমাদের ভিতর তিন-চার জন লোক সাঁতার জানত না, সে বেচারিরা একেবারে তলিয়ে গেল! সেই সর্বনেশে জীবটা লাফাতে লাফাতে জলের ধার পর্যন্ত এল। তারপর এতগুলো শিকার হাতছাড়া হয়ে গেল দেখে, মনের দুঃখে আকাশপানে মুখ তুলে ভয়ানক চ্যাঁচামেচি শুরু করে দিল।

অনেকক্ষণ সাঁতার কেটে আমরা শেষে এই দ্বীপে এসে উঠলুম।

এখানে এসে প্রথম কদিন আমরা বনের ফলমূল খেয়ে কাটিয়ে দিলুম। তারপর হঠাৎ একদিন একরকম আশ্চর্য হাঁসের বাসার খোঁজ পেলুম-সে হাঁসদের ডানা নেই। তারপর থেকে ফলমূলের সঙ্গে সেই হাঁসের মাংস আর ডিম পেয়ে এখন আর আমাদের পেটের ভাবনা ভাবতে হয় না।

কি বলছেন? আগুন কোথায় পেলুম? সেও বড় অবাক কারখানা, বাবুজি! ওই যে পাহাড় দেখছেন, দিনরাত ওর ভিতরে আগুন জ্বলছে। আমরা ওইখান থেকেই আগুন। আনি!

আবার এই দেখুন, পাথর ঘষে ঘষে আমরা কেমন সব বর্ষার ফলা, তির আর ছুরি ছোরা-কুড়ুল তৈরি করেছি। অস্ত্রগুলোতে কেমন ধার হয়েছে, দেখছেন তো? এই সব ছুরি আর কুড়ুল দিয়ে গাছ কেটে কখানা ছিপও বানিয়ে ফেলেছি, এখন দরকার হলে জলের উপরেও আনাগোনা করতে পারি! খোদাতালার দয়ায় আমাদের আর অন্য কোনও কষ্ট নেই বটে, কিন্তু আজ কদিন থেকে নতুন এক বিপদ উপস্থিত হয়েছে।

রোজ রাত্রে কি একটা অদ্ভুত জন্তু আমাদের সন্ধান পেয়ে বেজায় উৎপাত শুরু করেছে। এরমধ্যেই সে আমাদের দল থেকে পাঁচজন লোককে ধরে নিয়ে গেছে, আমরা কিছুতেই

তার হাত থেকে ছাড়ান পাচ্ছি না। এক রাত্রে চাঁদের আলোয় জন্তুটাকে আমি দেখেছি। দেখতে তাকে বাঘের মতো বটে, কিন্তু সে বাঘ নয়। কারণ বাঘের চেয়েও সে ঢের বেশি বড়, আর তার মুখের দু-দিকে হাতির মতো দুটো দাঁত আছে।

কি বললেন বাবুজি? সেকেলে খাড়া-ঘেঁতো বাঘ! সে আবার কীরকম বাঘ?

তা সে বাঘই হোক আর যাই-ই হোক, আমাদের আর এ-দ্বীপে থাকা পোষাবে না। এইবেলা প্রাণ নিয়ে এখান থেকে না পালালে একে একে সবাইকেই মরতে হবে। এখান থেকে কোথায় যাই, বলতে পারেন?

.

জাহাজ! জাহাজ

সোনাউল্লার গল্প শেষ হলে বিমল বললে, সোনাউল্লা, তোমাদের বাহাদুরি আছে বটে। এই সৃষ্টিছাড়া মুল্লুকে তোমরা এমন করে সংসার পেতে নিয়েছ।

সোনাউল্লা দাড়িতে হাত বুলোতে-বুলোতে বললে, কিন্তু বাবুজি, এ সংসার আবার তুলতে হবে। নইলে ওই খাঁড়া-সেঁতো বাঘ নিশ্চয়ই আমাদের ফলার করে ফেলবে।

আমি বললুম, আচ্ছা সোনাউল্লা, তোমরা এক কাজ করো না কেন? আমরা যে গুহায় এতদিন ছিলুম, সে গুহাটা খুব বড় আর নিরাপদ। তার ভেতরে অনায়াসে একশো জনের ঠাই দিতে পারে। চলো, আমরা সকলে মিলে সেইখানে আবার ফিরে যাই?

সোনাউল্লা বললে, সে ঠাই এখান থেকে কত দূরে বাবুজি?

আমি বললুম, তা ঠিক করে বলতে পারি না। তবে আমরা যে পাহাড়ে থাকি, তার উপরে চড়ে দেখেছি এখানে এই একটি বই দ্বীপ নেই। তা যদি হয় তাহলে আমরা নৌকোয় চড়ে পূর্বদিকেই ওই জঙ্গলের কাছে গিয়ে নামলেই পাহাড়ের খুব কাছে গিয়ে পড়ব।

সোনাউল্লা বললে, তাহলে সেই কথাই ভালো। আমরা কাল সকালেই এখান থেকে পালাব। সকলকে খবরটা দিয়ে আসি–এই বলে সে উঠে গেল।

রামহরি মুখ ভার করে বললে, এদের দলে মোছলমানই বেশি। গুহার ভেতরে এতগুলো মোছলমানের সঙ্গে থাকলে আমাদের যে জাত যাবে বাবু!

আমি বললুম, এতই যদি জাতের ভয়, তাহলে আজ এদের হাতের রান্না মাংস কী করে খেলে রামহরি?

কে বললে আমি মাংস খেয়েছি? সব আমি লুকিয়ে বাঘাকে দিয়েছি। আমি খালি ফলমূল খেয়ে আছি!

বিমল হাসতে-হাসতে বলল, তাহলে তুমি এক কাজ করো রামহরি! আমরা আমাদের গুহায় ফিরে যাই, আর তুমি একলা এখানে বাস করো। এই দ্বীপে তোমার যে মহাদেব আছেন, তুমি রোজ প্রাণ ভরে তাঁর পূজা করতে পারবে আর তোমার জাতও রক্ষা পাবে।

কী যে বলো খোকাবাবু, সব ব্যাপারে ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না।–বলতে বলতে রামহরি রাগে গসগস করতে করতে সেখান থেকে উঠে গেল!

.

পরদিন সকালেই আমরা ছিপে চড়ে বেরিয়ে পড়লুম।

অনেকক্ষণ পরে আমরা যেখানে গিয়ে থামলুম, ঠিক তার সামনেই সেই ভয়াবহ অরণ্য, যার ভিতরে পথ হারিয়ে আমাদের প্রাণ যায়-যায় হয়ে উঠেছিল।

সেইখানে আমরা ছিপ ছেড়ে নেমে পড়লুম। ডাঙায় উঠে বালুকা প্রান্তরের দিকে তাকিয়েই আমি দেখতে পেলুম, দূরে সমুদ্রের ধারে আমাদের আশ্রয়স্থান সেই সুপরিচিত পাহাড়টি আকাশপানে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

ঘণ্টা দুই পরে আমরা আবার আমাদের সেই পুরাতন গুহার মধ্যে ফিরে এলুম।

সেই দিন সন্ধ্যার সময়েই চারিদিক অন্ধকারে ডুবিয়ে ভীষণ এক ঝড় উঠল–তেমনি ঝড় আগে কখনও দেখিনি। সাগরের অনন্ত বুক থেকে তরঙ্গের এমন এক অশ্রান্ত কান্না ভেসে এল যে, পৃথিবীর আর সমস্ত শব্দ যেন কোথায় তলিয়ে গেল। ঝড়ের দাপটে আমাদের পাহাড়টা পর্যন্ত থরথর করে কাঁপতে লাগল।

আমি বললুম, বিমল, এমন এক ঝড়ই আমাদের এই দ্বীপের দিকে টেনে নিয়ে এসেছিল, মনে আছে কি?

বিমল বললে, মনে আছে বইকী। সেদিনের কথা কি এ জীবনে আর ভুলতে পারব?

কুমার বললে, আজকের এই ঝড়টা যদি দ্বীপটাকে আমাদের দেশের দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারত!

এমনি গল্প করতে করতে আর ঝড়ের হাহাকার শুনতে-শুনতে আমরা একে-একে ঘুমিয়ে পড়লুম।

হঠাৎ অনেকের চিৎকারে আর টানাটানিতে আমার ঘুম ভেঙে গেল–শুনলুম কমল চিৎকার করে বলছে, বিনয়বাবু জাহাজ, জাহাজ।

তাড়াতাড়ি উঠে বসে দেখি, গুহার ভিতরে ভোরের আলো এসে পড়েছে আর আমার পাশে অত্যন্ত উত্তেজিত মুখে দাঁড়িয়ে আছে বিমল, কুমার, কমল ও রামহরি।

জিজ্ঞাসা করলুম, ব্যাপার কী, তোমরা এত গোলমাল করছ কেন?

বিমল বললে, শিগগির উঠে আসুন বিনয়বাবু, দ্বীপের কাছে একখানা জাহাজ এসে নোঙর ফেলেছে।

শুনেই এক লাফে উঠে দাঁড়ালুম, তারপর ছুটে গুহার বাইরে গিয়ে পুলকিত নেত্রে দেখলুম, আকাশে বাতাসে কোথাও আর ঝড়ের চিহ্ন নেই এবং নীলসমুদ্রের উপরে একখানি লালরঙের প্রকাণ্ড জাহাজ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

চোখের সামনে, সেই জাহাজের গায়ের উপরে ফুটে উঠল–গঙ্গা-ধোয়া, আম কাঁঠালের বন-দিয়ে-ঘেরা, কোকিল-পাপিয়া-ডাকা আমাদের বাংলাদেশের আসল ছবি!

.

ট্রাইশেয়াটপস

আনন্দের প্রথম আবেগটা কেটে গেলে পর সবাইকে ডেকে বললুম–ভাই সব! আজ এতদিন পরে ভগবান আমাদের ওপরে মুখ তুলে চেয়েছেন। এতদিন পরে আবার আমাদের দেশে ফেরবার সুযোগ ঘটেছে, এমন সুযোগ গেলে আর পাব না! তোমরা সবাই মিলে চিৎকার করো, আমি আর বিমল সেইসঙ্গে বন্দুকের আওয়াজ করি। তাহলেই জাহাজের লোকেরা শুনতে পাবে।

আমাদের দল এখন খুব ভারী। কাজেই সকলে মিলে যখন চিৎকার করতে লাগল, সারা আকাশটা যেন কেঁপে উঠল। তার উপরে আমার আর বিমলের বন্দুকের আওয়াজ।

হঠাৎ জাহাজ থেকেও বারদুয়েক বন্দুকের শব্দ হল।

কমল আনন্দে লাফাতে লাফাতে বললে, শুনতে পেয়েছে! শুনতে পেয়েছে! জাহাজের লোকেরা আমাদের চিৎকার শুনতে পেয়েছে।

কুমার বললে, ওই যে জাহাজ থেকে দুখানা নৌকা নীচে নামিয়ে দিচ্ছে! ওই যে, জনকয়েক লোকও দড়ির সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামছে।

রামহরি বললে, দেখে মনে হচ্ছে ওরা যেন জাহাজি গোরা!

দুখানা নৌকো তীরের দিকে আসতে লাগল।

রামহরির কথাই সত্য। নৌকোর উপরে যারা রয়েছে, তারা সকলেই নীল পোশাক পরা বিলাতি খালাসি!

নৌকো তীরের কাছে আসবামাত্র আমরা তাড়াতাড়ি তার কাছে ছুটে গেলুম। আজ কতদিন পরে পৃথিবীর নতুন লোকের সঙ্গে দেখা! সাহেব হলেও তাদের যেন ভাই বলে মনে হতে লাগল।

একজন সাহেব আমার কাছে এগিয়ে এলেন। তার পোশাক দেখেই বুঝলুম নিশ্চয়ই তিনি জাহাজের উচ্চপদস্থ কর্মচারী।

তিনি ইংরাজিতে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের দেখে তো ভারতবর্ষের লোক বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু আটলান্টিক মহাসাগরের এই অজানা দ্বীপে তোমরা এলে কেমন করে? আমাদের জাহাজ ঝড়ের তোড়েই এদিকে এসে পড়েছে, নইলে এ-দ্বীপে তো কখনও কোনও জাহাজ থামে না!

আমি বললুম, সাহেব, আমরা মঙ্গলগ্রহে ছিলুম, সেখানকার উড়োজাহাজে চড়ে এখানে এসেছি?

কী বললে? তোমরা মঙ্গলগ্রহে ছিলে?

হ্যাঁ, সায়েব।

তুমি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ?

না সাহেব। বিশ্বাস না হয়, আমাদের সঙ্গীদের জিজ্ঞাসা করুন।

তা হলে তোমরা সবাই পাগল!

হ্যাঁ সায়েব, প্রথমে আমাদের কথা পাগলের প্রলাপ বলেই মনে হবে বটে। কিন্তু পরে আমাদের সব কথা শুনলেই বুঝবেন আমরা সত্যি বলছি কিনা। আপাতত আমরা আর কিছু চাই না, এই ভয়ানক দ্বীপ থেকে আগে আমাদের উদ্ধার করুন।

এ দ্বীপকে ভয়ানক বলছ কেন?

সায়েব, এখানে যেসব ভীষণ জীবজন্তু আছে, তুমি স্বপ্নেও কখনও তাদের দেখনি।

সে আবার কি?

এ-দ্বীপের বাসিন্দা কারা জানো? পাহাড়ের মতো উঁচু ডিপ্লোজাকাস আর ডাইনসর, হাতির মতো বড়-বড় ষাঁড়, উড়ন্ত সরীসৃপ বা টেরোডাকটাইল, খাঁড়াতে বাঘ, দানব শ্লথ-

আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই সাহেব হো হো করে হেসে উঠে বললেন, থামো, থামো, আর পাগলামি কোরো না।

সেই সঙ্গেই গোরা খালাসিরা চারিদিক কাঁপিয়ে বিকট চিৎকার করে উঠল।

ফিরে দেখি আমাদের কাছ থেকে খানিক তফাতেই একটা ছোটখাট বনের ভিতর থেকে সাহেবের ব্যঙ্গ-হাসির মূর্তিমান প্রতিবাদের মতো কিম্ভুতকিমাকার প্রকাণ্ড এক জানোয়ার বেগে বেরিয়ে আসছে। কেবলমাত্র তার মুখটাই বোধহয় সাতফুটেরও চেয়ে বেশি লম্বা এবং তার মাথার উপরে ত্রিশূলের মতো তিনটে ধারালো শিং ও তার মুখখানা দেখতে যেন অনেকটা আমাদের জগদ্ধাত্রী দেবীর কাল্পনিক সিংহের মতো। তার চেহারা দেখে বুঝলুম সে হচ্ছে ট্রাইশেরাটপস।

সাহেব আর গোরা-খালাসিরা চোখের পলক না ফেলতেই এক ছুটে নৌকোর উপরে গিয়ে উঠল এবং বলাবাহুল্য আমরাও সকলে গিয়ে নৌকোর উপরে আশ্রয় নিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করলুম না। নৌকো দুখানা জাহাজের দিকে চলল, সাহেব আমার করমর্দন করে

বললেন, তোমার কথার অবিশ্বাস করেছিলুম বলে এখন আমি ক্ষমা চাইছি। আজ যা দেখলুম জীবনে আর ভুলব না।

জাহাজ ছাড়ল, মানুষের দেশে আবার আমাদের পৌঁছে দেবে বলে। আবার যে স্বদেশে ফিরতে পারব, এই আনন্দে আমাদের সমস্ত মন যেন আকুল হয়ে উঠল।

কিন্তু ঠিক শেষমুহূর্তেই এই দানব রাজ্যের কয়েকটি সুপরিচিত দূত আকাশপথে আর একবার আমাদের দেখা দিলে। তারা সেই গরুড় পাখি বা টেরোডাকটাইল! বিশ ফুট জুড়ে ডানা ছড়িয়ে তারা উড়ে যাচ্ছে দলে দলে।

যে দুটো পাখি আমাদের খুব কাছে ছিল, হঠাৎ তাদের মধ্যে ঝগড়া বেধে গেল। কি বিষম তাদের ঝটাপটি কি কর্কশ তাদের চিৎকার!

জাহাজশুদ্ধ লোক ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখতে লাগল। অনেক গোরা-খালাসি হাঁটু গেড়ে বসে উপাসনায় প্রবৃত্ত হল। একজন পাদ্রি তাঁর ক্রুশখানা উঁচু করে তুলে ধরলেন সকলের মুখ দেখে মনে হল নিশ্চয় তারা তাদের উড়ন্ত প্রেতাত্মা বা নরকের দূত বলে ধরে নিয়েছে। স্ত্রীলোকরা আর শিশুরা তো কেঁদেই অস্থির-কেউ কেউ মুচ্ছিত হয়ে পড়ল।

এমনি ভয়, বিস্ময়, আর্তনাদের মধ্যে জাহাজ বেগে অগ্রসর হল, গরুড় পাখিরাও ধীরে ধীরে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। পাদ্রিসাহেব বললেন তার পবিত্র ক্রুশ দেখেই শয়তানের দূতেরা ভয় পেয়ে আবার নরকে পালিয়ে গেল।

ময়নামতীর মায়াকানন ক্রমেই আকাশের নীলপটে মিলিয়ে যাচ্ছে, পাহাড়গুলোকে দূর থেকে দেখাচ্ছে চিত্রেলেখা মেঘের মতো।

রামহরি বললে, বাবু, দেশে ফিরে এবার আর আমি তোমাদের দলে ভিড়ব না!

বিমল হেসে বললে, কেন?

তোমরা সব করতে পারো বাবু! কোনওদিন হয়তো আবার স্বশরীরে স্বর্গে যাওয়ার বায়না ধরবে। তোমাদের পায়ে দূর থেকেই নমস্কার।

বাঘার মাথা চাপড়ে কুমার বললে, হ্যাঁ রে বাঘা, তোর কী মত?

বাঘা ল্যাজ নেড়ে জবাব দিলে, ঘেউ, ঘেউ, ঘেউ।